আমার পথের গল্পগুলো

গৌরব দে

২০১৩ থেকে লেখা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে লেখা
ছোট গল্প, অনু গল্প, অসমাপ্ত গল্প ও কিছু ছোট ট্যাবলেট

আমি ?

আমি ক্ষীণ। আমি সরল আপেক্ষিক। আমি নিশ্চুপ রঙিন। আমি হাস্যজল। আমি স্থির। আমি সীমাহীন স্বপ্ন। আমি ভালোবাসা। আমি আগামী। আমি আশাবাদী। যা কিছু সুন্দর সেখানেই আমি। সব সত্যে আমার অবস্থান। আমি প্রতিক্রিয়াশীল। আমি উত্তম। আমি হিমুর হলুদ পাঞ্জাবী। আমি সৃষ্টি। আমিই পরিবর্তন।

আমি খারাপ। আমি মিথ্যা। আমি স্বৈরাচারী কৃপণ ধূসর অহংকারী। আমি সতেজ আকাশে ছোট কালো দাগ যা নষ্ট করে পুরো শুভ্রতা। আমি নিষ্পাপ হৃদয়ে বিভিসিকার ছাপ।

আমার পছন্দের কোন রঙ নেই। আমার পছন্দের গান নেই। আমার পছন্দের শার্ট নেই। এমনকি পছন্দের নাম পর্যন্ত নেই। কারণ আমার পছন্দ পরিবর্তনশীল। আমি প্রতিটা সৃষ্টির স্বাদ নেয়ার জন্য ক্ষুধার্ত। আমি আটকে থাকিনা সীমাবদ্ধতায়। আমিই স্বাধীন। সকল শেকল আমি ভেঙ্গে দেই ছোট হাসির স্রোতে।

আমার পরিচয় বাঁধ ভাঙ্গা সমুদ্রের গর্জনে। আমার ঠিকানা পাহাড়ের না পৌঁছতে পারা চুড়াই। আমার স্পর্শে সকল দূরত্ব স্ফটিক কণার মত কাছে আসে। আমার
নীরবতায় লুকিয়ে থাকে অসংখ্য মহাকাব্যের বাণী।

আর হ্যাঁ, আমি মারাত্তক পজেটিভ - রক্তে ও চিন্তায়।

মন ছাড়া মানুষগুলো যদি রাস্তায় ঘুরে
বেড়াতে পারে তবে সূচি ছাড়া একটা বই
কেনই বা টেবিলের কোনাই পড়ে থাকতে
পারে না ?
অবশ্যই পারে। এটা তেমনই একটা বই।
উল্টে পাল্টে যেকোন পৃষ্ঠা থেকে পড়তে
পারো।

এই পৃষ্ঠা ইচ্ছাকৃত ভাবে খালি রাখা হয়েছে ॥

পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি|

এই ছোট্ট বইটাতে যে লেখাগুলো আছে সেগুলো সেই ২০১৩ কিংবা তার কিছু আগে থেকে শুরু করেছিলাম| অনেকদিন পর সেসব গুছিয়ে একটা ছোট সংগ্রহ করে রাখার উদ্দেশে এই ছোট"নোট বই" এর অবতারনা করলাম|

খামখেয়ালিভাবে লেখাগুলো পরিপক্বতার মানদণ্ডে বিচার করলে হয়ত তেমন ভাল স্থান পাবেনা, তবে বিভিন্ন অবস্থান বিচারে সেসবে জড়িয়ে আছে অনেক আবেগ ও অনুভুতি| আশা করি মৌসুমি পাঠকেরা এই আবেগ অনুভব করতে পারবেন|

আরেকটা জরুরি কথা বলে রাখা ভাল| যেহেতু লেখাগুলো খামখেয়ালি ভাবে লেখা তাই অসংখ্য বানানে ও শব্দ গঠনে ভুল চোখে পরবে, অনুগ্রহ করে সেসব ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন|

গৌরব দে
২৮ শে জুলাই ২০২৪ ॥ ব্যাংকক

দার্জিলিং ॥ ২০২৩

ব্যাংকক ॥ ২০২৪

ইস্কুল

মুখে আলো এসে পড়তেই টের পেলাম স্বপ্ন রাজ্যের বাইরেটা সকাল হয়ে গেছে| চোখ ডলতে ডলতে সামনের দিকে নজর পড়ল| এক্সটেনশনের পাশ দিয়ে ছোট মাটির রাস্তাটা গিয়েছে চুয়েট স্কুল বরাবর| হয়ত কিছু আগেও রাস্তাটা বেশ নীরব ছিল| এখন দু একজন পিচ্চির আসা যাওয়া শুরু হয়েছে| কিছু পরেই ক্লাস শুরু হবে| বাচ্চাদের স্কুলে আসার দৃশ্যটা সব জায়গাতেই মনে হয় এক, শুধু ব্যাক-গ্রাউন্ডটাই পরিবর্তন হয়| এদের বেশিরভাগই আসছে মায়ের সাথে, কেও আসছে পাশের বাড়ির ছেলেটার সাথে যার সাথে হয়ত কাল বিকেলে খেলার মাঠে প্রচণ্ড ঝগড়া করেছে, ঘুম থেকে উঠেই সেসব দিব্বি ভুলে গেছে, আর কেও আসছে দল বেঁধে, যদিও দলের মধ্যে গল্পটা সেভাবে এখনো জমে উঠছেনা, সবারই মেজাজ এখন তিরিক্ষি হয়ে আছে, সকালের মায়ের বকুনিটা এখনও মাথা থেকে যায়নি| একটু পেছনে আরেকজন আসছে| কিছুদুর যেতেই তার জুতার ফিতাটা খুলে যাওয়ায় হাটতে বেশ অসুবিধা হচ্ছে| কিছুক্ষণ চেষ্টা করেও ঠিকঠাক বাঁধতে পারলনা| প্রতিদিন মা যখন সুন্দর করে ফিতা দিয়ে ফুল বানিয়ে দেয় সে কিছুতেই বুঝতে পারেনা কোন বাঁধনের পর কোনটা দিতে হবে, বারবার গুলিয়ে ফেলে গিঁট লাগিয়ে দেয়| এটা অবশ্য ওর একার সমস্যা না, আমাদের সবার জাতীয় সমস্যা| অর্ধেকটা বুঝেই বাকিটা দেখার আর প্রয়োজন মনে করে না|

সমস্যাটা আমার নিজেরও আছে| ক্লাস সেভেনে পড়ি| হালকা পাতলা দাবা পারতাম বলে স্কুলে দাবাতে নাম দিয়ে বসলাম| খেলার একটা সময় প্রতিপক্ষের ঘাম ছুটতে লাগল| সে রাজাকে নিয়ে নাকানি চুবানি খাচ্ছিল , আর আমি বিরদরপে চেক দিচ্ছি, কিন্তু এভাবে তো খেলা চলতে পারেনা, রাজাকে চেকমেট দিতে পারলে তবেই আমি জিতব| কিন্তু এই ব্যাপারটা আমি জানতাম না বলে সেবারের মত টসের মারপ্যাঁচে পরে হেরে গেলাম| ব্যাপার একই| একটা পর্যায় পর্যন্ত জেনে নিজেকে বীর মনে করা|

ইদানীং এই দলের লোক সংখ্যা বারছেই| সব ক্ষেত্রেই| যেমন একটা ক্যামেরায় ছবি তোলার বাটনটা কোথায় সেটা জেনে গেলেই হল, ফেসবুকে নিজেকে ফটোগ্রাফার বলে চালাতে আর দেরি হয় না| কিংবা ফটোশপের ব্রাইটনেসটা কমানো বাড়ানো শিখে ফেলতে পারলেই হয়, হয়ে যায় ফটোশপের ওস্তাদ| কপি পেস্ট করাও নিঃসন্দেহে একটা আর্ট কিন্তু তাই বলে কলার খোসা ভাল লাগল

বলে কমলার গায়ে পড়িয়ে দেয়াটা কি যৌক্তিক ?
অভিনয়টা না শিখেই যেমনটা রাতারাতি তারা বনে যাচ্ছে হিরো |
নিজের আগ্রহ থাকলে সেটা পরিপূর্ণ ভাবে শিখে নাও, গুরু হতে না পার ভণ্ড হইয়ো না | না জানাটা দোষের কিছুনা | কিন্তু না জেনেও জানার ভান করাটা অবশ্যই দোষের | শিখতেও কেন এত কার্পণ্যতা !!!

১১ মার্চ, ২০১৫ | চট্টগ্রাম

প্রদীপ

আমার মনে হয় পৃথিবীতে খুব বেশি আজব জিনিস হল প্রদীপ | যখন জ্বলে তখন কত সুন্দর লাগে , মনেই হয়না যে এটা নিভতে পারে | আর যখন নিভে যায়- কার বলার সাধ্যি আছে এটা কিছু আগে চারিদিক আলোকিত করে রেখেছিলো !!!

১৯ এপ্রিল, ২০১৩

মানুষ

আগে বাইরে বের হলে কতরকম মানুষ দেখতাম - খারপ মানুষ, ভালো মানুষ, কালো মানুষ, ফর্সা মানুষ, সুন্দর মানুষ , কুৎসিত মানুষ, লম্বা মানুষ, খাটো মানুষ। আরও কত কত মানুষ।
আর এখন দেখি মাত্র দুই ধরনের মানুষ।
ভালো মানুষ আর খারাপ মানুষ।
বুঝতে পারছিনা বাকিরা কোথায় গেলো ! নাকি আমার দেখার ক্ষমতা সীমিত হয়ে আসছে ???!!!

২১ এপ্রিল, ২০১৩

#ইন্সপাইয়ারড

মেরুন সোয়েটার

ছোট্ট শহর।
মানুষগুলোর সাথে শহরটাও বড় হচ্ছে প্রতিদিন। সাথে ছোট হয়ে যাচ্ছে ভালোবাসাগুলো ! তবে কাজের প্রতি, অফিসের প্রতিদিনের চেয়ার আর টেবিলটার প্রতি, চির চেনা রাস্তাগুলোর প্রতি ভালোবাসা বারছে। যন্ত্রের সাথে দূরত্ব কমছে, বারছে মানুষের সাথে মানুষের দূরত্ব। রঙ্গিন ভালোবাসা গুলো হয়ত মিলছে বইয়ের পাতায় কিংবা দের ঘণ্টার মুভিগুলোতে। খুব মাঝে মধ্যে কিউপিডদের দেখা মিলছে কফি সপ গুলোতে।
অবাক হই সত্যিকারের ভালোবাসা দেখলে। যেমনটা সেদিন হয়েছিলাম। ভীষণ রকম অবাক হয়েছিলাম।

স্টেশনের লোকাল ট্রেনের যাত্রী আমি। মাইনে থেকে টাকা কাটা যাবার ভয়ে নিয়ম মেনে হাজিরা দিতেই হয়। এরকমই একটা খুব সাদামাটা দিনে তাদের দেখলাম। তাদের দেখেই কেন জানি মিঃ আর মিসেস বোস নাম দিয়ে ফেললাম। দুজনের চোখেই অবাক করা এক ভালোবাসা খেয়াল করেছিলাম সেদিন। প্রতিদিন ৭.৪৫ বাজতেই স্টেশন এসে হাজির হবেন দুজন। আমিও এই ট্রেনেরই যাত্রী। ট্রেন আসতেই মিসেস বোস মিঃ বোসের কাঁধের ব্যাগটা ঠিক করে দেবেন। এরপর হাত ধরে জানালার পাশের সিটটাই বসে পরবেন। ট্রেন চলা শুরু হতেই মিসেস বোস ব্যাগ থেকে উল আর কাটা বের করে বুনতে শুরু করবেন মেরুন রঙ্গের সোয়েটারটা। আমি তাদের আগেই নেমে যেতাম বলে পরের গল্পটুকু আর দেখা হতনা কখনো।

এভাবেই চলছিল দিনের পর দিন। সপ্তাহের পর সপ্তাহ। মাসের পর মাস। দুজনার ঠোঁটের কোনে সেই একি হাসি, কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে দেয়া, তারপর হাত ধরে ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করা। সোয়েটারের অনেকটা অংশই হয়ে যেতে দেখলাম এর মধ্যে। মেরুন সোয়েটারের শুধু ডান হাতটাই বাকি ছিল হয়ত।

হঠাত একদিন খেয়াল করলাম তারা আসেননি। হয়ত ঘড়ির এলারমটা সময় দিতে ভুলে গেছে। কিংবা অফিসের ছুটি শুরু হয়েছে। এভাবে

অনেকটা দিন কেটে গেলো। তাদের অনুপস্থিতি গা সওয়া হয়ে গেলো। একটা সময় আমার চোখ ভিরের মধ্যে আর তাদের খুজলনা। জানালার পাশের সিটটার যাত্রী বদল হল। একটা সময় ভুলেও গেলাম তাদের।

অনেকটা দিন হল। সেই পরিচিত সকাল ৭.৪৫। শহস্র মানুষের কোলাহলে গদবাধা একি স্টেসান। এর মাঝেই চোখে পড়ল মিঃ বোসর উপর। সাথে মিসেস বোস কে দেখলাম না। আমার মুখে অজানা হাসি ফুটল। এরকম একটা অপরিচিত দম্প তির সাথে কি আমার এক মায়াবী সম্প র্ক হয়ে গেছিল ! জানিনা। কিছু না ভেবেই মিঃ বোসের দিকে এগোলাম। একি সাথে ট্রেনেও উঠলাম। এতদিনে তার মধ্যে অসংখ্য পরিবর্তন এসেছে। পরিচিত হাসিটা কোথায় যেন মিলিয়ে গেছে। মুখ ভর্তি খোঁচা দারি। কিছু বাদে কথা বলেই ফেললাম ,“আমাকে চিন্তে পারছেন ? ”

হালকা মাথা নারলেন। বুঝতে পারলাম উনি চিনতে পেরেছেন। খানিক বাদেই জিজ্ঞেস করলাম , “আপনার সাথে মিসেস বোস কে দেখছিনা যে ? দুঃখিত, মানে আপনার সাথে যেই মহিলা থাকেন তার কথা বলছি।”

অনেকটা সময় চুপ করে ছিলেন। একটা সময় বললেন,

“ও মারা গেছে। অনেক দিন থেকেই তো ক্যান্সারে ভুগছিল। এত করে বলতাম আমার সাথে আসার দরকার নেই, কে শোনে কার কথা ! প্রতিদিন আমার অফিসের স্টেসান অব্দি আসত, আমি চলে যেতেই ফিরতি লোকালে ও ব্যাক করত। বার বার বলত যতদিন আছি তোমার কাছাকাছি থাকতে চাই। আমি প্রতিবারই ওর মুখে হাত রেখেছি। কি করব বলেন, চাকরিটা ছাড়ার যে কোন উপায় ছিল না আমার ... ”

আরও অনেক কথা বলে গেলেন। আমি শুনলাম। তখনও আমার চোখে জল আসেনি। তবে নিজের গন্তব্যটা পেছনে ফেলে আসলাম। মিঃ বোসের গন্তব্য চলে আসল। উনাকে নামতে দেখলাম। হঠাত তখন খেয়াল করলাম আমার চোখের কোনে জল জমেছে যখন দেখলাম মিঃ বোসের গায়ে মেরুন রঙ্গের ফুল হাতা সোয়েটারটা -খেয়াল করলাম ডান হাতটার বুনন শেষ হয়নি তখনো।

৩০ শে মার্চ, ২০১৭ ॥ চট্টগ্রাম

মা-১

মা . . . আমার কাছে এটা শুধুমাত্র একটা শব্দ থেকেও বেশি কিছু | একটা বাক্য | একটা গল্প | একটা জীবন | আর অনেকগুলো অনুভূতি | ভালোলাগা, খারাপলাগা, নালিশ করা, ক্ষমা চাওয়া , আবদার কিংবা দাবী , উঁচু গলাই কথা বলা, ভয় পাওয়া আরও না জানি কত কি !

মায়ের কাছ থেকে বের হয়ে যখন বাইরের পৃথিবীটা দেখা শুরু করলাম তখন থেকে কত রকমই না জানি মানুষ দেখছি | এমন একজনকে দেখলাম না যে কিনা নিজের স্বার্থের কথা না ভেবে এক পা সামনে আগাই ! এদের দলে কে নাই ! সেই বন্ধুটাও যার সাথে একি টেবিলে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা মেরেছি | কিংবা সেই বড় ভাইটাও যাকে খুব কাছের মনে হত সেও চিন্তায় থাকে কিভাবে হাজারো মুখরোচক গল্প দিয়ে তার স্বার্থ হাসিল করিয়ে নেয়া যায় | শিক্ষকতা নাকি মহান পেশা ! সেটা এখন বাংলা বইয়ের রচনা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ | এখন মানুষ শিখক হয় একশ একটা স্বার্থের কথা মাথায় রেখে | এদের মদ্ধে যখন সেই মানুষটা আসবে যে কিনা নিঃস্বার্থে সাহায্য করতে আসছে বুঝতে হবে সে চাইছে বাকিটা জীবন যেন তার নেমপ্লেটটা গলাই ঝুলিয়ে রাখি |

আর এতসব স্বার্থের ভিরে শুধুমাত্র এই মা শব্দটার পিছেই কোন স্বার্থ খুজে পাই-নি , এখনো না !

একবার এরকম একটা গল্প পড়েছিলাম যে পৃথিবীতে আসার আগে এক শিশু, ঈশ্বরকে জিজ্ঞাসা করে যে সে কিভাবে এই বিশাল পৃথিবীতে চলবে যেখানে সে কিছুই পারেনা | ঈশ্বর একগাল হেসে বলে তোমার চিন্তা করার কিচ্ছু নেই, তোমার সাথে সব সময় একটা এঞ্জেল থাকবে | আর সেই “এঞ্জেল” টা হল মা | আমার মা |

মা, জানত, বাইরের জগতের মানুষগুলো এমন অনেক ব্যাপারে বেশ পারদর্শী যেগুলো তুমি আমাকে মোটেও শেখাওনি | তুমি আমাকে কখনই অন্যের দুর্বলতায় হাসতে শেখাওনি | শেখাওনি ভদ্রতার মুখোশের আড়ালে কিভাবে মানুষের ক্ষতি করতে হয় | আর বিশেষত অহংকারের বা অতি মাত্রায় আত্ম মর্যাদার দাপটে অন্যের থেকে নিজেকেই আলাদা করে ফেলার ব্যাপারটা শিখতে বাদ পরে গেছে |

মা, হাজার কাজের ভীরে হয়ত প্রতিদিন ঠিকঠাক খোঁজটুকুও নিতে পারিনা , এমনকি যেই কথাগুলো গত কাল বলার কথা ছিল সেটা আজ বলছি , এর মানে এইনা যে তোমার কথা মনে পরেনা | একটা কথা কি জানত এমন একটা দিন এখনও আসেনি যেদিন চোখ বন্ধ করে তোমার হাসি মুখটা দেখিনি | আলাদা একটা শান্তি লাগে | সত্যি বলছি |
আমি জানি এমন অনেকে আছে যারা হয়ত এই লেখাটা দেখা মাত্র চোখটা সরিয়ে নিবে | হয়ত চোখের কোনে জল জমবে | তাদের জন্য সত্যি খুব খারাপ লাগে | আর মনে মনে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি যেন এরকম দিন আমার না আসে |

I would pick my Mother to be my Mother again and again in every lifetime.

১২.০৫.২০১৫ | চট্টগ্রাম

মা-২

একটা প্রমান সাইজের কাগজ যদি সমান ভাগে ভাজ করা হতে থাকে তবে সেটা সাতবারের বেশি ভাগ করা যায়না এই কথাটা ভুল প্রমাণ করার চেষ্টা করছি সেই তখন্ থেকে| মায়ের সম্প র্কে লিখতে বসে এইসবই মাথায় খেলছে| ব্যাপারটা এমন যে জলের অপর নাম জীবন আমরা জানি কিন্তু কখনই জলের উপর কোন রচনা লিখিনি !

অন্য সবার মতই বলতে গেলে হয়ত লিখব আমার মা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মা| খুব স্বাভাবিক একটা কথা| জানোকি একটা অক্টোপাস তার ডিম থেকে বাচ্চা ফোটা অব্দি (এক বছরের কাছাকাছি) সেসব রক্ষার জন্য একচুলও নরেনা, এমনকি খাবার খাওয়ার জন্যও না, অনেক সময় নিজের শরীরের অংশ খেয়েও ক্ষুধা মেটায় ! তবে তো একটা অক্টোপাসের মা-ও সেরা মা - তাই নয় কি ? আসলে পৃথিবীর প্রতিটা মা-ই সেরা|

আমি মাকে বলি, আচ্ছা মা তোমার সাথে যদি বাবার বিয়ে না হত তাহলে তোমাকে আমরা কখনই পেতাম না তাই না ? মা হাসে| আমরা কতই না ভাগ্যবান !

ছোট বেলা থেকেই জালাতন করার অভ্যাস নাকি আমার| যখনই রাত হবে ,শুরু হত আমার কান্না| এদেশে বিরক্ত হয়ে মামলা দেয়ার রেয়াজ থাকলে হয়ত প্রতিবেশীর পক্ষ্য থেকে তখনি দু তিনটে মামলা খেয়ে ফেলতাম| পাসের বারির দাদু তো নিজ থেকেই মাঝ রাতের কান্না বন্ধ করার কবিরাজি তাবিজ এনে দিয়েছিল| সারাদিন কাজ করেও এই রাতটুকুতেও বসে বসে কাটিয়েছে আমার মা|

স্কুল ভীতিটা নাকি আমার একটু বেশিই ছিল| আমাকে ক্লাসে বসাতে কোনভাবেই রাজি করানো জাচ্ছিল না| পুরো একটা বছর আমার সাথে সারাটা ক্লাস পিছে বসে কাটিয়েছে মা|

স্কুলে খেলতে গিয়ে পড়ে ব্যথা পেয়েছি| রাত জেগে ব্যথায় মলম দিয়েছে মা| টিফিন বক্স খুলে কি দেখলে আমার মুখে হাসি ফুটবে সেটাও জানত মা| সক্কালে ঘুম থেকে উঠলে নিয়ম করে প্রার্থনা করলে - প্রতিদিন নিয়ম করে জল খেলে এক্সামে ভালো করলে স্যারের পরা করলে - এমন হরেক রকমের শক্ত শক্ত কাজ করার প্রেক্ষিতে নানারকম লোভনীয় অফারের প্রলোভনও দিত মা|

যতবার হোঁচট খেয়েছি , পিছিয়ে পরেছি, মনের কাছে হার মেনেছি- ঠিক ততবারই হাসি মুখে পাসে দারিয়ে থেকেছ, বারবার আমার উপর ভরসা রেখে এগিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখিয়েছু মা |
সপ্নেরা বাসা বাধতে শুরু করেছে | রঙিন সব মানুষের সাথে চলতে হয়েছে পথে | কত রকমের , কত রঙের মুখোশ পরা মানুষ দেখছি এত রঙের ভীরে যেন গায়ে কালো রঙটা না লেগে যায় সেটার দেখার দায়িত্ব নিয়েছিলু ছোট স্মিত হাসি দেয়া আমার মা |
ছোট্ট আমি আসলেই অনেক বড় হচ্ছি | বয়সের সিরিগুলো পেরিয়ে অনেকটা উপরে উঠে এসেছি | মায়ের কালো চুলে সাদা পাক ধরেছে | চশমা ছাড়া নাকি এখন পরতেও পারেনা| কিন্তু তারপর সত্যি বলছি সেই চোখে ভালোবাসার এতটুকুও কমতি দেখিনি কখনো | আমার ভুলের হিসেব কসতে বসলে হয়ত এত কাগজ লাগবে যে তা দিয়ে আমার দেশের এক বছরের রাজস্যের হিসেব কসে ফেলা যাবে | তারপরেও কি তোমার চোখে আমার ভুলগুলো চোখে পড়ে না ? নাকি ভুল গুলো এখনো তোমার ভালোবাসার পাহারে চাপা পরেই থেকে যায় মা ?
মা |
তোমার প্রোলভন গুলো আরেকবার দিবে , প্লিজ ? খুব মিস করি | আরেকবার | তোমার কাছে কি তাই কখনো বড় হতে পেরেছি বল ?

১৬.১০.২০১৮ | রাজশাহী

বাবা

চট্রগ্রামে সেবার প্রথম আসব , একা | ছোট বাচ্চার মত সিটে বসিয়ে দিয়ে কমপক্ষে হাজার বার তো হবেই ‟সাবধানে থেকো" কথাটা বলার | আজ আমি ফিফথ ইয়ারে | বয়স অনেকটাই হয়েছে | কিন্তু তারপরেও ‟সাবধানে থেকো" কথাটা ততক্ষণই কানে আসে বাসটা না যতক্ষণ তার চোখের আরাল হচ্ছে | ভাল লাগে | সত্যি ভাল লাগে | এরকম বাবা আর কয়জনই বা পাই ?

আজকে আমার বাবা দিবস | বাবার জন্মদিন |

বাবা রিটাইয়ার করেছে বেশ কিছুদিন হল | তারপরেও মাঝে মাঝে অফিস যেতে হয় কিছু কাজে | সেবার বাসায় গিয়ে কোন কাজ ছিলনা (কখন থাকেও না) বলে বাবার সাথে গেলাম | অবাক হলাম প্রতিটা মুহূর্তে | ধারণা ছিল আধুনিক সন্মান শুধুমাত্র দুইটা জিনিস থাকলেই পাওয়া যায় - টাকা আর না হয় ক্ষমতা | দুইটার কোনটাই না থাকার পরেও সবাই দেখা মাত্রই চেয়ার ছেরে উঠেছে ‟কেমন আছেন ?" বলে হাত বারিয়ে দিয়েছে | নাহ , সততার সন্মান আছেই |

বাবার সাথে জানিনা কি কি মিল আছে | তবে সব থেকে বড় অমিলটা হল কথা বলাই | সে মুখ খুললে কথার ফুলঝুরি বের হয় আর আমি হাজারে একটা কথা বলি | সে কিভাবে কথা বলে মানুষকে এত আপন করে নিতে পারে সত্যি আজও সেটা আমার কাছে রহস্য |

মিডিল ক্লাস ফ্যামিলিতে বড় হওয়াই সব থেকে বড় সুবিধা হল বাবাকে সব সময় পাশে পেয়েছি | চাহিদার তুলনাই প্রাপ্তিটাও বেশিই ছিল | আর বেশি ছিল ছোট ছোট আনন্দগুলো | হলফ করে বলতে পারি মন্দ কিছুই শিখিনী তোমার কাছে|

বাবা জানত, ছোটবেলার সেই শুক্রবারের ঘোরাঘুরিটা খুব বেশি মিস করি !

ধমক দিয়েছ কখন ? মনে পরে ?

ছোট ছোট কিছু দায়িত্ব পালন করছি বলে মনে হয় আমি একটু হয়েছি ভাবছ, মোটেও না | সামান্য হোঁচট খেলেই তোমার দুশ্চিন্তার যেখানে শেষ থাকেনা সেই আমি কিভাবে তোমার কাছে বড় হই বল ?

যদি আমার ডাকা প্রথম শব্দটা মা হয় তবে দ্বিতীয়টা হলফ করে বলতে পারি বাবা | বাবাকে নিয়ে আগেও বেশ কয়েকবার বলেছি, আজও বললাম, ভবিষ্যতেও বলব | বলার সুযোগ (সৌভাগ্য) যখন পেয়েছি তখন কি তাই হাত ছাড়া করা যায় ?

১৫ জানুয়ারি, ২০১৫

গান

গান শোনার রোগটা আমি জেনেটিকালি পেয়েছি। বাবা মারাত্তক কিশোর,আশা, লতা, মান্না কিংবা হেমন্তর ভক্ত ছিল। সেই সময় আমাদের বাসায় এদের ক্যাসেটের বিশাল সংগ্রহ ছিল। এরপর সিডি আসল। বাবার সিডি কেনার বাতিকটা আমায় পেয়ে বসল। বাবার পাশাপাশি মায়ের কাছেও গানের সেইরকম কদর ছিল। তার ইচ্ছাতেই আমার দুই দিদির গান শেখা। যদিও এই ব্যাপারটাতে আমার ক্ষেত্রে মা সফল হতে পারেনি। পুরাই গানময় পরিবার । তো বাবার ক্লাসিক্যাল গান শোনা দেখে আমিও বাংলা ক্লাসিক্যালের ফ্যান হয়ে গেছিলাম। কিশোর আর হেমন্তর কিছু গান এতো বেশি অসাধারণ লাগত যেন সারাদিন শুনতাম। যাহোক, বাংলা ক্লাসিক্যাল শোনা অনেকটাই কমে গেলো চুয়েট এসে। এক সময় লিস্ট থেকে বাদ পরে গেলো।
আজ সকাল থেকেই গুরি গুরি বৃষ্টি পরছিল। ঘুম থেকে উঠে বাইরে এক টিনের ছাপ্রিতে বসে গরম গরম সিঙ্গারা আর চা খাচ্ছিলাম আর বৃষ্টি দেখছিলাম। হটাত খেয়াল করলাম পাশের সেলুনে সেই সময়কার বাংলা ক্লাসিক্যাল বাজছে। নস্টালজিক হয়ে গেলাম। বেশ কিছুখন বসে শুনলাম। এরপর রুমে এসে ল্যাপটপ ঘেঁটে যতগুলো হাতের কাছে পেলাম সবগুলো প্লেলিস্টে অ্যাড করে দিলাম। সেই তখন থেকে চলছে। এখনো শুনে যাচ্ছি। এই গান গুলো সত্যি অদ্ভুত রকম সুন্দর। কখন পুরানো হয় না।

৪ অক্টোবর, ২০১৩

বন্ধুত্ব

তখন কলেজে পড়ি | মোটামোটি ভালো ছেলে ছিলাম | এখনকার মত এত দুষ্ট বুদ্ধি ছিলনা | যাহোক , সেদিন বেশ গরম পরেছিল | পাশে টেবিল ফ্যান ঘুরছে | রাত ৮ কিংবা ৮|৩০ বাজে | কলেজ ছাত্রের জন্য বেশ রাত | হালকা হালকা বৃষ্টি শুরু হল | বই নিয়ে পড়ার টেবিলে বসে আছি | এরমদ্ধে বন্ধুর কল | শুরুতেই ওর জিজ্ঞাসা

৯এতো শব্দ কিসের মামা ?চ

: (বরাবরের মত অর্ধেক জবাব দিলাম) বাতাসের শব্দ

: এতো বাতাস ! তুই কোথায় ?

: (জানিনা কি ভেবে হটাত বলে বসলাম) পদ্মার ধারে

: এতো রাতে নদীর ধারে কি করিস ?

: মামা আমার কিচ্ছু ভাল লাগছেনা , আমি হয়ত আর বাচবনা

: ধুর ব্যাটা , ফাজলামি করিস না | তুই কোথায় সত্যি করে বলতো ?

: আমি সিরিয়াস | আমি আর পারছিনা দোস্ত | বাবা মা জানে না | জানলে হয়ত অনেক কষ্ট পাবে | তুই প্লিজ একটু সামলে নিস |

(এরপর শুরু হল ওর একগাদা জ্ঞানের আলাপ | আমি এই, আমি সেই, কেন এইসব ভাবছি , ব্লা ব্লা ব্লা)

একসময় কল কেটে দিলাম | শুরু হল ওর কল বৃষ্টি | ঘটনার নাটকীয়তা বাড়ানোর জন্য বেশ কয়েকবার কল কেটে দিলাম |

এরপর আমাকে অবাক করে দিয়ে একের পর এক আমার অন্য বন্ধুরা কল দিতে লাগল | বুঝতে দেরি হলনা যে মহাশয় অন্যদের এই কাহিনী জানিয়ে দিয়েছেন | কারো কল রিসিভ করলাম , কারোটা কেটে দিলাম | ব্যাপারটার বেশ মজা নিচ্ছি-লাম | ঘটনার বিস্তারিত জানালাম আমার সর্বসময়ের কুকর্মের সাক্ষী আমার এক-মাত্র অতি কাছের বন্ধু ছোড়দিকে |

এরমদ্ধে বৃষ্টি বেশ বেরে গেছে | ভালই যাচ্ছিলো | এরপরের ঘটনার জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না | বাসার বেল বেজে উঠল | মায়ের কথা শুনে বুঝলাম বন্ধুবর চলে আসিয়াছেন |

: কি হয়েছে বাবা এতো রাত্রে ?

: কাকিমা গৌরব কি বাসায় আছে ?

: হুম আছে , ওর রুমেই আছে

: আপনি জানেন না | ও রুমে নাই

: না বাবা , ওত রুমে বসে পড়ছে

বেচারা কোন কিছু বুঝে উঠতে পারছিলনা বলে ছুটে আমার রুমে চলে আশে | সেই দিনের সময়টার কথা আজো মনে পড়ে | ওর এক্সপ্রেসান দেখে আমার চোখে জল চলে আসছিল |
পরে ওর কাছে জানতে পারলাম আমাকে খোঁজার জন্য এতো রাতে বৃষ্টির মধ্যে সবাই পদ্মার পারে জড় হয়েছে ঘটনা কতটুকু সত্য সেটা বিচার না করেই |
এই হল আমার বন্ধুর নমুনা | ঘটনা অনেক আছে | এটা তার ভেতর খুব সামান্য একটা ছিল |
বাস্তবে সত্যিকার বিপদে পরেছি | সেসময় সবসময় তোদের সাথ পেয়েছি |
নিজেকে অনেক বেশি লাকি মনে হয় তোদের জন্য | তোরা এত্ত এত্ত ভাল |
তোরা আমাকে জানি অনেক বেশি ভালবাসিস |
আর হ্যাঁ , আমি মাঝে মাঝে হয়ত তোদের উপর একটু রাগ টাগ করি , কিছু মনে করিস না | করলেও কিছু করার নাই | ভবিষ্যতেও করব |
এতো অসাধারন বন্ধুদের শুভেচ্ছা জানানোর জন্য বছরের এই একটা দিন অন্তত আমার জন্য যথেষ্ট না | বছরের প্রতিটা দিন আমার বন্ধু দিবস |
তোরা ভাল থাকিস সবসময় |

৪ঠা আগস্ট, ২০১৩

অস্তগামী সূর্য

গতকাল সন্ধ্যা। ঘড়ির কাঁটা সাতটা ছুঁই ছুঁই করছে। এই মুহূর্তে আমার অবস্থান চট্রগ্রাম হতে চুয়েটগামী একটা বাসের ছাদ। নতুন বাতিক - বাসে সীট থাকলেও ছাদে বসতে হবে। রাতের আকাশ দেখতে দেখতে যাচ্ছি। হালকা ঠাণ্ডা পরেছে। হিম শীতল বাতাস যৌবনের উত্তাল গরম রক্তকে ঠাণ্ডা করে দিতে মরিয়া। কুয়াশার চাদরের ফাক দিয়ে সূর্যি মামা খানিকটা মুখ বেরে করে রেখেছে। বুঝতে পারছি তারও বেশ ঠাণ্ডা লাগছে। আর বেশিক্ষণ এভাবে থাকতে পারবেনা। আকাশটা অসম্ভব সুন্দর লাগছে। মনে হচ্ছে কেও একজন খুব যত্ন করে লু-মওনে রেন্ডার দিয়েছে। এতসত ভাবতে ভাবতে কিছুপর হঠাত চোখ গেলো চাঁদ মামার দিকে। তার সাহস দেখে বলিহারি। এই হিমশীতল বাতাসের ভেতরেও সে মুখ বার করে রেখেছে।

কিছুটা জ্যাম থাকলেও ড্রাইভার মামা এবার বেশ জোরেই টান দিল। মনেহয় বাসায় বউ রান্না করে বসে আছে। কখন তার জামাই আসবে। প্রতি রাতের মত একেসাথে খেতে বসবে। অবশ্য এই ঠাণ্ডার মনে কোন মায়া দয়া নাই। এরকম একটা রোম্যান্টিক সংসারেও সে যাবে রাতের সামান্য ভাতটুকু ঠাণ্ডা করে দেয়ার উছিলায়। সেখানে জাওয়ার জন্য তার আপ্রান চেষ্টা দেখে আমি তাজ্জব বনে যায়। বেচারা স্বামী ঘরের চালে যে ফুটোটা দেখতে পায়নি সে ঢুকবে ঐ ফাক গলে।

আমার পাশে আরও কিছু লোকাল যাত্রী উঠেছে। তাদের আলোচনার বিষয় গুলো কানে আসছে মাঝে মাঝে। কখন রাজনৈতিক , কখন সাংসারিক , মাঝে মধ্যে ধর্মীয়। এদের কথা সুনলে কার বলার সাদ্ধি এরা প্লেটো কিংবা এরিস্টটলের বই পরেনি। এদের নিজস্ব দার্শনিক চিন্তা তাদের থেকে কম কিসের ?

আমি এসব থেকে সরে এসে আবারো আকাশ দেখায় মন দিলাম। চলন্ত কালো আকাশ। তারও মনে হচ্ছে বেশ তারা আছে। আমার সাথে সাথে পাল্লা দিয়ে দৌড়চ্ছে। বেশ খানিকটা যাওয়ার পর মারুফ ভাই পেছন থেকে খোঁচা দিয়ে দূরে কি জানি ইশারা দিয়ে দেখানর চেষ্টা করল। কিছুখন তাকিয়ে থাকার পর যখন ওগুলো চোখে ঠিকঠাক ধরা দিল আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। বিন্দু বিন্দু আলোর বাক্স। ফানুস।

দূরে কোথাও ফানুস ওড়াচ্ছে। এগুলো আগেও দেখেছি। খুব কাছ থেকে। আবার খুব দূর থেকেও । নিজেও উড়িয়েছি। কিন্তু এইভাবে কখন একদম ধিরে ধিরে নিচ থেকে উরতে দেখিনি। আসতে আসতে ওরা উপরের দিকে উরছে। ঝাঁকে ঝাঁকে। দল বেধে। কোন দলনেতা নাই। ওরা হয়ত আমরা সবাই রাজা প্রথাই বিশ্বাসী। হটাত কেও কেও দলছুট হয়ে যাচ্ছে। কেও বা উপরে ওঠার শক্তি হারিয়ে ফেলছে। প্রতিনিয়ত দলে নতুন নতুন সদস্য যোগ হচ্ছে। এরা যেন শপথ করে এসেছে কে কার থেকে উঁচুতে উঠতে পারে। প্রতিটা মুহূর্ত আমার বিস্ময় বেরেই চলেছে। খেয়াল করলাম আমার পাশের সহযাত্রীদের দার্শনিক আলাপে বেশ ভাঁটা পরেছে। ওরা এখন বেস্ত প্রকৃতির রূপ আস্বাদনে।
বাসের গতি আরও বেরে গেলো। আমি তাকিয়ে আছি অসীমের দিকে। ওদের সাথে আমাদের অসম্ভব মিল খোঁজার চেষ্টা করছি।
কত সামান্য জিনিসেই না আমরা আনন্দ খুঁজে ফিরি। কত সামান্য জিনিসগুল আমাদের আশ্চর্য করে দেই। কি জোয়ান কি বৃদ্ধ। অথচ আমাদের আরও চাই চাই স্বভাব।
চুয়েটের সামনে এসে বাস দাঁড়ালো। নামতে ইচ্ছে করছেনা দুইটা কারনে। এক রাতের আকাশ আর ঐ ছোট্ট ছোট্ট ফানুস গুলো দেখে আমার পেট ভরেনি। আরও দেখতে চাই। আর দ্বিতীয়ত বাসের ছাদে ওঠা যতটা সহজ নামাটা ওতটা না। আমার সামান্য ভয় ভয় করে।

১৫ নভেম্বর, ২০১৩ ॥ চট্টগ্রাম

স্মৃতি

রাতে অনিকেত সাহেব বাড়িতে আসতেই দৌড়ে গিয়ে কোলে উঠে সৌম্য | এবছর ক্লাস ওয়ান শেষ করল সে | ক্লাসে ফার্স্ট হয়েছে বলে তাকে স্কুল থেকে পুরষ্কার হিসেবে একটা বই দিয়েছে | বইটা পেয়ে তার খুশির অন্ত নাই |

"বাবা দেখেছ আমি ফার্স্ট হয়েছি, আর ওরা আমাকে এই মজার বইটা দিয়েছে " - বাবার হাতে বইটা তুলে দেয় সে |

"বাহ, তাইতো"- ছেলের কপালে ছোট করে চুমু দেয় তার বাবা |

"বাবা, চল বইটা মাকে দেখিয়ে আসি"- বলেই বাবার হাত ধরে সিরি বেয়ে উপরে উঠে যায় সৌম্য |

"মা দেখেছ, বলেছিলাম না আমি ফার্স্ট হব, এই দেখ কত্ত সুন্দর একটা বই দিয়েছে ওরা ", "বাবা দেখেছ মা আজ অন্যদিনের থেকেও বেশি হেসে তাকিয়ে আছে আমার দিকে"- বাবার দিকে তাকিয়ে সৌম্য হাত দিয়ে ইশারা করে আকাশের সব থেকে উজ্জল তারাটার দিকে |

ছেলের কথা শুনে চোখের কোনায় জল জমে অনিকেত সাহেবের | আরও শক্ত করে জরিয়ে ধরে মাথা নেরে সায় দেয় সে |

পিতা পুত্রের ভালোবাসার নীরব সাক্ষী হয়ে থাকে উত্তরের দেয়াল থেকে উকি দেয়া মাঝ বয়সি ডালিম গাছটা ।

১৭ নভেম্বর, ২০১৬ | চট্টগ্রাম

#ইন্সপাইয়ারড স্টোরি

বৃষ্টি বিলাস

জানালার সামনের বিশাল গাছটার নাম জানিনা | হযত খুব পরিচিত , তারপরও জানিনা | আমার নাম জানা জিনিসের সংখ্যা হাতে গোনা|
কিংবা হয়ত জানলেও ভুলে যাওয়ার প্রবণতার কারনেই আর মনে করতে পারিনা | সামনের গাছটার ডালগুলো আমার জানালার পাশ দিয়ে এসে আমাকে উকি দিচ্ছে | মনে হচ্ছে আমার মায়ের কড়া আদেশ আছে ওর উপর, আমি কখন কি করি তার ঠিকঠিক হিসাব দিতে হবে |

গত ১৫ মিনিট থেকে জানালার বাইরে তাকিয়ে আছি | আমার নজর
গাছটার দিকে না | গাছে বাসা বাধা ঐ পাখির বাসাটার দিকে | বাসা
বানাতে হলে যে স্থাপত্যে পড়তে হযনা সেটা ঐ পাখিটা প্রতিদিন একবার করে বলে যায | হলের চারতলার এই রুমটাতে আসার পর থেকেই ওর সাথে আমার বেশ ভাব জমে গেছে | আগে আমাকে খুব একটা পাত্তা দিত না , বেশ ভাব নিয়ে থাকত | এখন ওর প্রতিদিনের রুটিনে যোগ হয়েছে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়ে দেয়া | আজকাল ওর দিকে তাকালে ও মোটেও চোখ সরিয়ে নেই না | বড়ই অদ্ভুত ! ওর বাসার সদস্যার সংখ্যা সম্পর্কে আমি কিছুটা সন্দিহান | মাঝে মাঝে তিন জন তো কখন কখন চারজনকে ঘোড়াফেরা করতে দেখি | মনে হয তার হাসবেন্ড হযত দেশের বাইরে থাকে | হযত মাঝে মধ্যে মন কাদলে বউ বাচ্চাদের দেখতে আসে | তার
২ টা সন্তান | একটা বেশ সান্ত , অনেকটা আমার মত , আর অন্যটা বেশ দুষ্ট | শেয়ার করার ব্যাপারটা ওর মধ্যে এখনো তৈরি হযনি | ওদের সাথে ভাব জমানোর বেশ চেষ্টা করেছি, লাভ হযনি |

হালকা বৃষ্টি পডছে | বৃষ্টির ছাঁট জানালা দিয়ে মুখে এসে পডছে | বুঝতে পারছিনা শীতের দিনে এভাবে বৃষ্টি বিলাস করা ঠিক হচ্ছে কিনা | হালকা বাতাস আমার লেপটাকে জরিয়ে ধরতে চাইল | আমি তাকিয়ে আছি সামনের দিকে | আকাশটার দিকে | মুখ ফুলিয়ে বসে আছে | এমন অসময়ে আসার জন্য মনে হয় বৃষ্টির সাথে ঝগডা হযছে |
বাচ্চাগুলো জুবুথুবু হয়ে ভিজছে | সকাল থেকে তাদের মায়ের দেখা
নাই | মনে হয় তারা বুঝে উঠতে পারছেনা কি করবে | ওদের সাথে তাল মিলিয়ে আমিও বৃষ্টির সাথে ভাব জমাই | একটু বৃষ্টি বিলাস করি |

শুক্রবার | ১৬.০১.২০১৫ | সকাল ১১.৪৫ | চট্রগ্রাম

মৃণালিনী

সেদিন আবারও তোমার কথাই মনে পড়েছিল যেদিন জোছনার চাঁদ মুখ লুকিয়েছিল গুটিকয় মেঘের আড়ালে | আর জোনাকির দল পথ দেখিয়েছিল সুদূর শৃঙ্গের কোল ঘেঁষে গজিয়ে ওঠা ঐ ছোট্ট কুঠিরের দিকে | সেদিন সত্যি খুব যেতে ইচ্ছে করেছিল তোমার কাছে , বলতে ইচ্ছে করেছিল অনেক না বলা কথা |

ইচ্ছে করেছিল তোমার রূপের স্তুতিতে মেতে উঠি আরেকবার | ইচ্ছে হয়েছিল আরেকবার স্মরণ করিয়ে দেই অনুস্বারের ছোট্ট বিন্দুটা কেবল তোমার কপালেই মানায়, ছোট্ট লাল টিপ হিসেবে | সাদামাটা শাড়িটাও যেন মাধুর্য খুঁজে পায় তোমার পরনে | মনে করিয়ে দিতে ইচ্ছে করেছিল তোমার চুড়ি আর নুপুরের শব্দ মিলেমিশে যে মাদকতা তৈরি করত তা হয়ত ঐ নেশাখোরের আফিম কিংবা মদের বোতলেও কখন খুঁজে পাওয়া যায়নি | ক্লিওপেট্রা কিংবা হেলেনও হয়ত তোমার সেই মায়াবি সৌন্দর্যের কাছে কুর্নিশ করে যেতে চেয়েছিল সেদিন |

খুব বেশি সরলতা মাখানো কথার জালে আবারও আটকা পরতে ইচ্ছে করছিল সেদিন | তোমার স্ফীত হাসির আড়ালে আমি কয় হাজারবার প্রাণ হারিয়েছি তা আবারও মনে করিয়ে দিতে ইচ্ছে হয়েছিল | তোমার অবাঞ্ছিত আবদারগুলোর অপ্রাপ্তির শাস্তিতে নিজেকে আবারও তোমার কাঠগড়াই দাড় করাতে ইচ্ছে হয়েছিল | ছোট্ট পথটাও বিশাল করে দিতে ইচ্ছে হয়েছিল শুধুমাত্র তোমার পাশে হাঁটব বলে |

হাত ভরতি করে বকুল আর শিউলি দিতে ইচ্ছে করেছিল সেদিন | আর ইচ্ছে করেছিল তোমাকে নিয়ে লিখব এক মহাকাব্য কিংবা একটা ছোট্ট কবিতা, যার হয়ত কোনই ছন্দমিল থাকবেনা , কিন্তু কথা দিতেই পারি আবেগ থাকবে পুরোটুকু ঠিক আগেরবারের মতই |

ছোট ছোট পুরনো স্বপ্নগুলোকে নতুন ফ্রেমে বেঁধে ছোট্ট রঙিন ঘরটাই ঠিক পাশাপাশি দাড়িয়ে জানালাই উঁকি দিয়ে মস্ত চাঁদটা দেখতে ইচ্ছে হয়েছিল সেদিন | আমার ইচ্ছেগুলোর কথা তুমিকি টের পেয়েছিলে ?

১৬ অক্টোবর, ২০১৫ | চট্টগ্রাম

পাবনার ডায়েরি থেকে

ঌ আঙ্কেল, পেয়িং ওয়ার্ডটা মেইনলি কাদের জন্য ?ঌ
ঌ এটাতে যেকেও থাকতে পারে তবে এখানে থাকতে টাকা লাগে, সাধারন ওয়ার্ডগুলোর মত ফ্রি না | এখানে থাকা খাওয়াটা সাধারণত একটু ভাল | আর তাছারা এখানে বেশিরভাগ বড়লোক গোছের মানুষগুলোই থাকে |চ
“ বড়লোক পাগল !!!?? “
“ হুম, ঐ যে ওনাকে দেখছ সে তিনটা গার্মেন্টস এর মালিক , আর তার পাশের জন এক সাংসদের ভাই , আর এই রুমের মানুষটার ছেলে একজন বড় ডাক্তার , বারান্দার মানুষটার ভাই একজন আর্মি অফিসার ... “
আরও আছে একজন ইঞ্জিনিয়ার, একজন মারাত্মক মেধাবী ছাত্র, আরও দুজন শিল্পপতি এবং এরকম আরও অনেকে |
টাকা থাকলেও সুখ থাকেনারে পাগলা | সুখ নিজের ব্যাপার | খুঁজে নিতে হয় |

২১ এপ্রিল, ২০১৫ | পাবনা

রোমন্থন

আমি মনে করি আমার অভিজ্ঞতার ঝুলি বেশ সমৃদ্ধ | অন্তত সময় আর পরিবেশ অনুযায়ীতো বটেই | গল্প ফেঁদে আসর জমাতে পারিনা ভুলে যাওয়ার রোগের জন্য | তবে বিভিন্ন সময় অনেক কিছু মনে পরে যায় | তাই ঠিক করেছি অন্তত সে গুলোই লিখে রাখব, একটু গুছিয়ে |

অন্ধকার রাতে রেল লাইনের উপর হাটার অভিজ্ঞতাটা বেশ মজার | স্বপ্নের মত হেটে যাওয়া যায় | গতিপথ একটাই | দৃষ্টি আটকানোর সুযোগ নেই | যতটা হাটতে পারা যায় হাটো | কখনো লাফিয়ে কখনো ধিরে | ভেতরের বাচ্চাটা বেরিয়ে আসতে চাই | পাশে ধরার জন্য কারও হাত লাগেনা | নিঃসঙ্গতার উৎসবের মেলা বসে এই পথে | রঙিন মেলা |

আরেকটা অসাধারণ জায়গা হয়ত ছোট্ট খরস্রতা নদীর ধারগুলো | রাত বিরেতে সুযোগ পেলেই বসে পড়তে ইচ্ছে হয় | এখানেও একাকিত্তের মেলা বসে | তবে রঙিন না, এটা একটু অভিজাত মেলা | কারও মিথ্যা কৃত্তিম বানোয়াট কথার থেকে হাজার গুন ভালো লাগে হালকা বাতাসের সাথে ছোট স্রোতের হাসি শুনতে |

আমি যখন রাতের হালদার পাশটাই বসতাম মনে হত নদীর জল মাত্রাতিরিক্ত অবাধ্য রকমের কালো হয়ে গেছে | কালো আকাশটাও এতটা কালো না | নদীর বুকে মাঝে মাঝে ছোট্ট ছোট্ট আগুনের কুণ্ডলী গুলো রূপকথার মত গল্প ফেঁদে বসত | যার কল্পনার চোখ হয়ত বেশ ছোট সেও এখানে অনেক কিছুই দেখে ফেলতে পারবে |

১১ জুলাই, ২০১৬

যমুনার পাড়

গত ২.৫ ঘণ্টা ধরে যমুনার ধার ঘেঁষে দুলাভাইয়ের সাথে বাইকে করে যাচ্ছিলাম | কোন উদ্দেশ্য ছাড়া যাত্রা ! একদিকে যমুনা আর পাশ দিয়ে বিস্তীর্ণ শস্যখেত | এখন সব অন্ধকার | কিছু আগ পর্যন্ত সবুজের তীব্রতাই চোখ জোলে যাচ্ছিল | শুধু চলছি না, সাথে দুলাভাইয়ের সাথে বক বক করছি | অবশ্য করার চেয়ে শুনছি বেশি | কিছু আগে হটাত কোন আগাম বার্তা ছাড়াই তুমুল বৃষ্টি শুরু হল | এরকম অভিজ্ঞতা আগে ছিলনা | বৃষ্টির ফাক গলে বেশিদূর আগানো গেলো না | একটা ছোট চায়ের ছাপ্রিতে থামতেই হল | আমার এই সুখের দিনে আকাশ তার দুঃখ বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারল না , হেসে ফেলল | আর আমাদের চলা আবারো শুরু হল | সেই যমুনার পার , শস্যখেত আর তার সাথে এখন নতুন করে যুক্ত হয়েছে একটু আগ পর্যন্ত লুকিয়ে থাকা চাঁদ মামা | নিজের চেহারা নিয়ে তার বরই গর্ব | এক দৃষ্টিতে যমুনার জলে নিজের চেহারা দেখছে আর মুচকি মুচকি হাসছে | আমার ক্যামেরাটা থাকলে তার এই ভাব আরও একশগুন বারিয়ে দিতাম | দুঃখ নাই তাতে | তেলা মাথায় নাহয় এইবার তেল নাই দিলাম | চাঁদ মামা, তুমি হাসতে থাকো , তোমায় দেখতে সত্যিই চমৎকার লাগছে | গতপরশু তোমায় দেখলাম সোহয়ারদির শিখা চিরন্তনের পাশে বসে বসে হাসছিলে | আর এখন তুমি হয়ত গাইছো

" যমুনার জল দেখতে কালো , চান করিতে লাগে ভালো "

এমনি করে যায় যদি দিন যাক না ...

১৫ জুলাই, ২০১৩

প্রিয় রং ... আসলেই কি প্রিয় ?

মনের কথা মনে রেখে মনের ফ্যাট বারানোর কি মানে?
যা মনে আছে বলে ফেলাটাই সিম্প লিসিটি ▯
ভালো লাগলে বল, খারাপ লাগলেও বল|
সুন্দর লাগলে বল, কুতসিত লাগলেও বলে দাও|
যাকে নিয়ে সমস্যা তাকে বল, ডন্ট ব্রিং দ্যা থার্ড পারসন হু ক্যান স্প য়েল ইউর লাইফ|
এভয়েড কম্প লিকেসি, স্টে সিম্পল

শরত

ছন্ন ছাড়া বিবর্ণ সময়গুলো ছুটে চলে শ্বেত শুভ্র মেঘের উপর ভর করে,
অনন্তকালের পানে অবাঞ্ছিত কোন এক স্ফীত হাসির টানে
নির্ঘুম বর্ণালী দিশেহারা অগ্নিঝরা নিশি পানে
অবারিত সে সম্ভাবনার উদ্দেশে ...
শরতের বাতাস যে এখনই শরীরের প্রতিটি ভাজে ভাজে অনুভব করা যায়
দ্বিপ্রহরে চঞ্চল পানকৌড়ির অবাক চাহুনিতে হারিয়ে গেলে কি তাই চলে !

৩০ জুন, ২০১৫ | চট্টগ্রাম

ছুটি

শেষ পর্যন্ত ছুটিটা পেলাম। পুজোর আগের বন্ধটার জন্য খুব বেশি অপেক্ষায় থাকি। মাথাটা রিস্টোর করার একটা সুযোগ পাওয়া যায়। ব্যাগটা গোছাতে গিয়ে মাথায় ঘু-রতে থাকে কি কি বাদ পড়ল। যা মন চাই পড়ুক গে, বিদেশিনীর হাত ধরে তো পালি-য়ে যাচ্ছিনা। ফেরত আসার উছিলাতো একটা থাকাই চাই !
বাসটা যে সময় সম্প র্কে আমার মত এতটা অসচেতন হবে বুঝিনি। মিনিট পেরিয়ে ঘণ্টা। ধৈর্য আমার অনেকটাই আছে, তাই বলে এভাবে সেটা নষ্ট করাটা মোটেও ঠিক হল না। জীবনানন্দ হয়ত তার বনলতা সেনকে দেখেও এতটা আনন্দিত হননি যতটা না আমি হলাম কিছুপর যখন হর্ন কানে আসল।

বেশ ঝকঝকে লাগছে বাসটা। বৃষ্টির সুবাদে হেল্পারদের অন্তত গাড়িটা পরিষ্কারের ব্যাপারে আলাদা করে সময় বার করতে হয়না।
রাত ১২ টা ৩৫। পিঠে ব্যাকপ্যাক আর হাতে একটা ব্যাগ নিয়ে উঠেই পুরো বাসট-াতে চোখ বুলিয়ে নিলাম। হালকা নীল আলোতে কাওকেই সেভাবে দেখা যাচ্ছেনা। আমার সিটটা ড্রাইভারের ঠিক পিছের রোতে তিনটা সিট বাদেই। জানালার পাশের সিটটা পাইনি বলে গজগজ করছিলাম। বৃষ্টির সাথে এবার আর ছুয়োছুয়ি খেলাটা হবেনা। কিছুবাদেই সহযাত্রী আসলেন। নাদুসনুদুস পঞ্চাশ-ঊর্ধ্ব এক লোক। চোখে হালকা ফ্রেমের চশমা। তেমন ভারি মালামাল নেই দেখে অবাক হলাম। গম্ভীর মুখ দেখে মনে হল মাত্রই কারও সাথে পূর্ণ দমে ঝগড়া সেরে আসলেন আর জিতটা মোটেও তার হয়নি। জায়গা করে দিতেই টুপ করে নিজের সিটে বসে পরলেন। তার-পর ছোট্ট ব্যাগ থেকে একটা বই বার করে পড়া শুরু করলেন। শেক্সপিয়ারের হ্যামে-লট। ভুল শুধরে নিলাম , আঙ্কেল ঝগড়া করেননি, হ্যামলেটের ভেতর বেশ ভালই ঢুঁকে পড়েছেন।
এবার আমি এমপিথ্রিটা বার করে হেডফোনটা কানে গুঁজে দিলাম। আকাশ পাতাল চিন্তার শুরুটা সাজাতে সাজাতেই বাসটা ছাড়ল। সাউন্ডটা কিছুক্ষন অফ রাখলাম। আশপাশের যাত্রীদের কথা শোনার চেষ্টা করলাম। সবই ভাসা ভাসা। বৃষ্টির সাথে মিলিয়ে যাচ্ছে। তবে একটা ছোট্ট মেয়ের কান্নার আওয়াজ পেলাম। আবার যন্ত্রটা অন করে হারিয়ে গেলাম।

হটাত করেই ঘুমটা ভাঙল। কানে এখনও গান বেজে চলেছে। ঘড়িতে সময় দেখলাম ৩ টা ১৫। বাইরে প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে সাথে অন্ধকারটাও আজ বেশি কুৎসিত মনে হচ্ছে। পাশের আঙ্কেল এখনও হ্যামলেটের ভেতরে ডুবে আছেন।

অনেকটা সময় পার করলাম চুপচাপ। ঘণ্টাখানিক হবে। একটা টোলপোস্টে গাড়ি কিছুক্ষণ দাঁড়াল। খেয়াল করলাম বৃষ্টিতে সামনের গাড়িটা স্প ষ্ট দেখাই যাচ্ছেনা। তবে ছোট একটা পিকআপ ভ্যান বোঝা যাচ্ছে। সামনে আরও দু তিনটা গাড়ি। গতি ভালই ছিল। আমাদের ড্রাইভার তাদের পাশ কাটিয়ে একটা টার্ন নিল। এরপরের ঘটনার জন্য আমি মোটেও প্রস্তুত ছিলাম না। হটাত আচমকা সামনে থেকে একটা ট্রাক এসে আমাদের বাসটাকে ধাক্কা দিল। বড়সড় একটা কাঁচ ভাঙ্গার শব্দ এতটা রোমাঞ্চকর হতে পারে না শুনলে বোঝানো অসম্ভব। মুহূর্ত্তের মধ্যে আরও অনেকগু-লা শব্দ যোগ হল। মোটামোটি সবাই ঘুমিয়ে ছিল বলে কেও টের পাচ্ছেনা কি হচ্ছে। খেয়াল করলাম বাসটা সরল দোলকের মত হালকা দুলছে। মানে ব্রিজটার ঠিক কিনারাই আমাদের অবস্থান। নিচের গভীর স্রোত আমাদের অপক্ষায় আছে। হটাত করেই অনেক কিছু বদলে গেল। আমি সিটে নেই। স্নানের পর চুলগুলো যেভাবে লেপটে থাকে কপালের সাথে সেভাবেই আছে, মনে হচ্ছে রক্ত স্নান করেই ফেলেছি। বাঁ পাটা নাড়াতে পারছিনা। পায়ের উপর পাশের আঙ্কেল মুখ থুবড়ে পরেছে , সামান্য নড়াচড়ার চেষ্টাও করলনা। পাসেই পরে আছে তার চশমাটা, একটা গাস ভাঙ্গা , মনে হচ্ছে বেশ যত্ন করে রক্ত দিয়ে সেটা পরিষ্কার করা হয়েছে। বইটা দেখছিনা। ধিরে ধিরে শব্দের বীভৎসতা টের পাচ্ছি। মোটেও শুনতে ইচ্ছে করছেনা। নড়াচড়ার যে সামান্যতম শক্তিটাও নেই সেটা টের পেলাম। কিছু আগের বাচ্চা মেয়েটার গলা শোনা যাচ্ছেনা , তবে তার মার গলা শুনতে পাচ্ছি। কাঁদছে। যতটা জোরে কাঁদা যায়।
হটাত করেই চিন্তাগুলো কেন্দ্রীভূত হয়ে গেল। মনে হল কেও জোর করে মায়ের কথ াটা মাথার মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। খুব বেশি দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে। কোলে মাথা রাখতে ইচ্ছে করছে। ঘুমব না। গল্প করব মায়ের সাথে অনেকটাখন। তখনও সে আমাকে সাহস দিবে, "আরে কিছু হয়নিতো তোমার, আমি থাকতে তোমার কিসের ভয় ?"
"মা, আমাকে একটু শক্ত করে ধরবে ?" চোখের জল হটাত কপালে এসে পরবে।
"মা, সত্যি আমার কিছু হবেনাতো ?" ধৈর্য্যের বাঁধটা তবে ভেঙ্গেই গেল , জরিয়ে ধরে কান্না শুরু করলে।
নিঃস্ব হওয়ার এইতো সুযোগ, দিতে পারি হাতের রেখা,

মুখে আলো এসে পড়ল। ভোর হচ্ছে। অন্যরকম একটা ভোর। হয়ত আমার শেষ ভোর। কিংবা নতুন শুরুর একটা ভোর। বাইরে বৃষ্টি কিছুটা কমেছে বলে শব্দগুলো কানে আসছে। অবাক লাগছে দুরে ঐ লাইট পোলের উপরে বসা কাকটাকে স্প ষ্ট দেখতে পাচ্ছি। কি বলতে চাচ্ছে সে ? মাকে গিয়ে কি বলবে আমার কথা ?

বাসটা আর ঝুলে থাকতে পারলনা। খুব জোরে একটা আঘাত হল মাথায়। জলের স্রোত বাচ্চাদের মত মারামারি করতে করতে বাসে ঢুকে পড়েছে। খুব বেশি কষ্ট হচ্ছে। চোখটা বন্ধ হয়ে আসল। ঝাপসা থেকে অন্ধকার। লালচে অন্ধকারে হারিয়ে জাচ্ছি ! খুব বেশি ইচ্ছে করছে সবার হাত একবার হলেও ছুয়ে আসতে। একটিবার। হয়ত শেষবার।

এক কানে এখনও হেডফোন টা গোজা আছে। অর্ণব তার গানটা মাত্র শেষ করল।

২৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৫। রাজশাহী

বাংলা ভাষার রূপ

আমার ধারণা শুধু মাত্র বাংলা ভাষাতেই একটা নাম নিয়েও এত রকমের তথ্য (?!) দেয়া যায় |

কৃষ্ণচূড়া বলা হয় কেন? যেখানে কৃষ্ণ মানে কালো|

(এই প্রশ্ন কখনো মাথায় আসেনি)

১. কৃষ্ণচূড়া - কৃষ্ণের ব্যবহৃত চূড়ার স্বরূপ| এখানে রংয়ের জন্য নাম নয়| আকৃতির জন্য নাম| কৃষ্ণচূড়া = কৃষ্ণের চূড়ার ন্যায়|

২. ভালোবাসার রং লাল তাই কৃষ্ণচূড়া ফুল এর রং লাল বর্ন

৩. কৃষ্ণের মাথায় ময়ুরের পালক থাকতো| লাল ফুলের একটা পাপড়ি দেখবেন ময়ুরের পালকের মতো| সেই জন্য নাম কৃষ্ণচূড়া| একইভাবে কাঞ্চন ফুলের নাম এসেছে| (কাঞ্চন ফুলের একটা পাপড়িও ময়ুরের পালকের মতো| কাঞ্চন(সোনা) বর্ণ থেকে সম্ভবত এই নাম এসেছে| কাঞ্চন বর্ণ বলে কৃষ্ণ/ রাধাকে অভিহিত করা হতো শুনেছি|)

৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দেয়া নাম - গুলমোহর |

৫. কৃষ্ ধাতু থেকে কৃষ্ণ শব্দটি এসেছে| কৃষ্ ধাতুর একটা মানে হচ্ছে আকর্ষণ করা, সবাইকে টেনে নেওয়া| আর চূড়া শব্দের অর্থ শীর্ষ অথবা ঝুটি| তাহলে অর্থ দাড়ায় গাছের চূড়া থেকে যে ফুল মানুষকে আকর্ষণ করে সেটাই কৃষ্ণচূড়া|

৬. রামদা কি রামের প্রিয় অস্ত্র ছিলো? মীরজাফর মানে তো বিশ্বাসঘাতক নয় তবুও কেনো সে বিশ্বাসঘাতকতা করলো

৭. কৃষ্ণ এই গাছের চূড়ায় উঠে বসে থাকতেন| যখন কৃষ্ণের কেউ খোঁজ করতেন তখন যে দেখে থাকতেন তিনি বলতেন কৃষ্ণ চূড়ায়| সেই থেকে হয়তো|(কৃষ্ণ কদম গাছে উঠতো, কৃষ্ণ চূড়ায় না|

৮. আমাদের দেশের সবচেয়ে বড় সমস্যা একটা সহজ কথা বলতে না পারা- আমি জানি না!

১১ই মে, ২০২০ ॥ রাজশাহী

আশা

আমি আশা | বাবা মার একমাত্র আদরের মেয়ে | আমার কেন জানি মনে হয় আমাদের পরিবারটা “ছোট্ট সুখের সংসার” এর থেকে একটু বেশিই সুন্দর | একমাত্র মেয়ে হওয়ায় আদরটা হয়ত তুলনামুলক ভাবে সব সময় বেশিই পেয়েছি |

একটা নিম গাছের সাথে লাগানো আমাদের সুখের বাড়িতে দুইটা ঘর | লাল ঘর আর ডান ঘর | লাল ঘরের একটা দরজার অর্ধেকটা লাল, তাই আমি অমন নাম দিয়েছি | আর ওটার ডান পাশেই ডান ঘর | ডান ঘরে বাবা মা থাকে | আর লাল ঘরে থাকি আমি আর আমার সাথে থাকে পরিবারের যাবতীয় সরঞ্জাম | এই ঘরের চালার বাম দিকটাই ছোট একটা ছিদ্র ছোট বেলা থেকেই দেখে আসছি | সেখান দিয়ে আসা একফালি আলো নীচে রাখা ঠাকুরের বেদি আলোকিত করে | সব কিছুর মত মায়ের ধারণা এটাও ঈশ্বরের ইচ্ছায় হয়েছে |

কালিকাপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় | এবার আমি ক্লাস সেভেন থেকে এইটে উঠব | আমাদের স্কুলের সামনেটাই একটা জারুল গাছ | আর পেছন দিয়ে গেছে আঁকাবাঁকা ছোট একটা নদী | মা নামটা বলেছিল , আবার ভুলে গেছি |

আমার বন্ধু , শৈলী | আমার বিড়াল | মানুষের যদি সুন্দর সুন্দর নাম থাকতে পারে, তবে বিড়ালের কেন থাকবেনা ? আমার যত মনের কথা সব ওকে বলি, আর ও সেসব শুনে মাথা নারতে থাকে | সেবার যখন স্কুলে রাবারটা হারিয়ে কাঁদতে কাঁদতে শৈলীকে বললাম, ও তখন কোথা থেকে যেন ঠিক খুঁজে এনে দিয়েছিল ওটা | আমার ধারণা ও আমার কথা বুঝতে পারে |

আমাদের সাদামাটা জীবনের রুটিনে খুব কমই ফাটল ধরে | মা অনেক ভোরে উঠে | উঠেই আমাদের দুইটা গরুকে খেতে দেয় | মাকে বারবার বলি তাদের খেতে দেয়ার সময় যেন লালিকে আগে খেতে দেয়া হয়, কারন ওর সাথেই আমার বেশি ভাব আর কালু আমাকে দেখলেই কেমন করে যেন তাকায় , আমার ভয় লাগেনা বুঝি ! মা আমার কথা সুনে-না , বললেই বলে তাহলে যেন আমি খেতে দি | আমিকি তাই এত সকালে উঠতে পারি ! পারিনাতো | এরপর মা উনুন পরিস্কার করেই বাবার জন্য ভাত বসায় |

এই ফাকে বাবা উঠে পরে | ছোট খাটো কাজগুলো শেষ করে ভাত খেয়ে মাঠে চলে যায় | আর যথারীতি মায়ের বকুনি খেয়ে চোখ ডলতে ডলতে আমি ঘুম থেকে উঠি | এরপর স্কুল | আমার স্বপ্ন আমি একদিন বিজ্ঞানী হব | তারপর এমন কিছু আবিস্কার করব যেন বাবাকে আর পরিশ্রম করতে না হয় | রাতে আমরা একসাথে খেতে বসি | সেদিন খেয়াল করে-ছি বাবা খাওয়া শেষে ঘুমানোর আগে এক ফাকে এসে কালু আর লালির কপালে চুমু দিয়ে যায় | সামান্য পশুকেও নিজের সন্তানের মত ভালোবাসা যায় !!!

২৩ জুন
এবার বেশ বৃষ্টি হচ্ছে| অন্যবারের থেকে অনেকটা বেশি| ঘরে বসে বৃষ্টি দেখতে আমার বেশ লাগছে| এর একটা বড় কারন হয়ত স্কুলে যেতে হয়না বলে|
২৫ জুন
দিনদিন বৃষ্টি আরও বাড়ছে| বাবা ভয় পাচ্ছে এর থেকে বেশি বৃষ্টি হলে ফসলের বেশ ক্ষতি হয়ে যাবে|
২৬ জুন
বৃষ্টি কিছুটা কমেছে| তবে একেবারে থামেনি|
অনেকটা দিন পর মায়ের কাছে অনেক জোরাজুরি করেই খিচুড়ি খেলাম|
বাবার চিন্তা এখনো কমেনি|
২৮ জুন
বৃষ্টি আবার বেরেছে| আমার লাল ঘরের বাম দিকের ছিদ্রটা বাবা গতকাল রাত অব্দি জেগে ঠিক করেছিল| দেখা গেলো সেটা দিয়ে আবার জল পড়া শুরু করেছে| ঠাকুর সরিয়ে ডান ঘরে রাখা হয়েছে| হয়ত এটাও ঈশ্বরের ইচ্ছা , মাকে অবশ্য জিজ্ঞেস করা হয়নি|
২৯ জুন
গতকাল রাতে নাকি স্কুলের পাশে নদীর বাধটা ভেঙ্গে গেছে| স্কুলে আজ হাটুপানি| বাবা মাকে বলছিল ফসলের ক্ষেতেও জল ঢুকেছে| মনে হচ্ছেনা রক্ষা করা যাবে|
৩০ জুন
জল অনেকটা বেরেছে| শৈলী বলল মিনহাজ আর রাতুলের বাড়ি ডুবে গেছে , তারা নাকি বাড়ি ছেরে দিয়েছে| আমাদের বাড়ি নদি থেকে বেশ কিছুটা উচুতে, তাই ডুবার সম্ভাবনা কম|
২ জুলাই
আমাদের উঠানে জল ঢুকেছে| মা বাবা কে বলেছিল বাড়ি ছেরে যেন আমরা নিরাপদ জায়গায় যায় , বাবা যাবেনা| বাবার ধারণা জল যা বাড়ার বেরেছে , এরপর কমতে শুরু করবে|

৫ জুলাই

হটাত করে জল অনেকটা বেরে গেছে| আমরা ঘর ছেরেছি| বাবা ছোট দুইটা ভেলা বানিয়েছে| একটাই আমি শৈলী বাবা আর মা| অন্যটাই কালু আর লালি| আমরা ঘরের খুব সামান্য জিনিস নিতে পেরেছি| সামান্য কিছু শুকনো খাবার| আমরা যখন ঘর ছেরে ভেলায় উঠলাম বাবা চোখ মুছছিল| বৃষ্টির জল বেশ দক্ষতার সাথে চোখের জল ধুয়ে দেয়ার দায়িত্ব নিয়েছিল|

৭ জুলাই

কিছুদিন থেকে শৈলী কিচ্ছু খাচ্ছেনা| আমরা যে খাদ্যের অভাবে আছি ও হয়ত টের পেয়েছে, ওর জন্য রাখা সামান্য খাবারটুকুও হয়ত তাই চাচ্ছে আমরাই খাই|

৮ জুলাই

জল এখন বেরে মাথা অব্দি এসেছে|

সকালে লালি ভেলা থেকে পরে যায়| অনেক চেষ্টা করেও বাবা তুলতে পারেনি ওকে| একটা সময় যখন লালি ডুবে যাচ্ছিল বাবাকে তখন কাঁদতে দেখেছি| আমিও কেদেছি| সাথে মাও| চোখের সামনে ওকে তলিয়ে যেতে দেখলাম| প্রথম দিকে বেশ ছটফট করছিল| তারপর ধীরে ধীরে একটা জড় পদার্থ হয়ে গেল| নিস্তেজ নিষ্প্রাণ জীব|

৯ জুলাই

সকাল থেকে শৈলীকে পাচ্ছিনা| দুঃখটা আর কান্না দিয়ে বের হচ্ছেনা, এখন বুক চেপে বসে আছে|

বাবা কাল থেকে কিছু খাচ্ছেনা| মা রক্ত বমি করছে| অবাক হচ্ছি এখন পর্যন্ত সাহায্যের জন্য কেও আসলো না|

প্রান টাকে খুব তুচ্ছ মনে হচ্ছে|

১০ জুলাই

গতকাল রাতে বাবা মা ঘুমিয়ে থাকার সময়ই কালু ভেলা থেকে পরে যায়| অবাক হলাম সামান্য ছটফট করলনা , হয়ত সেই শক্তি টুকুও আর নেই| আমি অবাক হচ্ছিলাম না, শুধু দেখছিলাম ওর ডুবে যাওয়া| এখন আর রাত করে বৃষ্টি আসছেনা বলে চোখের কোনায় জলটা অনুভব করতে পারছিলাম| তবে বুকের মধ্যে মোচড় দেয়নি| মানুষের জীবন যেখানে তুচ্ছ সেখানে একটা পশুর মৃত্যু বেদনা দায়ক হতে পারেনা|

আমাদের খাবার প্রায় শেষের দিকে| যা আছে তা তিন জনে জল মিশিয়ে খাচ্ছি|

১২ জুলাই
আমার শরীর জরে পুরে যাচ্ছে | তাকিয়ে থাকতে পারছিনা বেসিক্ষন | বেসিরভাগ সময় চোখ বন্ধ করেই থাকি | আজ সকালে হটাত চোখ মেলতেই যে দৃশ্য দেখলাম সেটা হয়ত না দেখাই ভালো ছিল | একটা ভেলাই দুইটাই মৃত শরীর জাপটে পরে আছে | আর তাদের উপর বসে থাকা চারটা শকুন মাংস খুবলে খুবলে খাচ্ছে, মানুষের মাংস | মৃত মানুষের মাংস |
১৫ জুলাই
আজ ভোরে আজান দেয়ার কিছু পর মা মারা যায় | মারা যাওয়ার আগেও মা ভগবানের মূর্তিটা বুকে জরিয়ে ধরে রেখেছিল | মুখে লেগেছিল স্মিত একটা হাসি ! মৃত্যুতেই মুক্তি ?! তার ঈশ্বর জানেন |
বাবা মৃত শরীরটার পাশে পাথরের মূর্তির মত বসে ছিল |
একইদিন আমাদের বাড়ির সামনের নিম গাছটার সাথে আটকে থাকতে দেখলাম কালুর মৃত শরীরটা | আর তার ঠিক পাশেই ছিল শৈলী | মৃত | ওকে দেখে কাঁদতে ইচ্ছে করে-নি | সত্যি বলছি , একবারও মনে হয়নি বুকটা ছিরে যাচ্ছে | একবারও চোখ ঘোলা হয়ে আসেনি |
একটা মৃতপ্রায় শরীরের ভাবলেশহিন চোখ দেখলাম নির্বাক ভাবে ওদিকে তাকিয়ে আছে | বাবা |
১৯ জুলাই
দিনের বৃষ্টি আর তেমন নেই | তবে মাঝে মাঝে হালকা হয়ে আসে | আবার ছেরেও যায় | প্রকৃতির খেলা হয়ত শেষ হচ্ছে |
খাবার দুদিন আগেই শেষ |
বাবা এখন তেমন নরাচরা করেনা | সারাদিন ঝিম ধরে শুয়ে থাকে |
২১ জুলাই
আমার জর কিছুটা কমেছে | তবে বুকে প্রচণ্ড ব্যথা করে সব সময় | কাল দেখলাম মা আমার চুলে তেল দিয়ে বিনুনি করে দিচ্ছে আর শৈলী কোলে বসেছিল চুপটি করে ! আমার “ ছোট্ট সুখের পরিবার “ আরও ছোট হয়েছে, সাথে সুখটাও ভেসে গেছে বন্যার জলে | আমার চারিপাসে শুধু মৃত্যুর গন্ধ | আর আমি, আশা , তাকিয়ে আছি আমার পাশে পরে থাকা বাবার নিথর শরীরটার দিকে |
আমি এখনো আশা রাখি কেও একজন আমার মুখে সামান্য কিছু খাবার দিবে | পরিস্কার একটা কাপড় আর একটু জল হলেই চলবে |
আর আশা রাখি জারুল গাছের ঐ সামনের স্কুলের ক্লাস এইটের ঘরটা থেকে স্যার আমার নাম ধরে ডাকবেন , আর আমি বলবু ইয়েস স্যার !
আমি আশা |

২৭ আগস্ট, ২০১৭ | চট্টগ্রাম

ভালোবাসা-১

দুপুরে ভরপেটে খেয়ে একটা ঘুম দিবো ভাবছিলাম, এমন সময় ডোরবেল বেজে উঠলো|
একরাশ বিরক্তি নিয়ে দরজা খুললাম | অবাক হয়ে দেখলাম আমার সামনে যে মেয়েটি দাড়িয়ে আছে তাকে নির্দ্বিধায় বনলতা, কাদম্বরী কিংবা এযুগের অবনীর সারিতে দাড় করানো যায় | মনে হতে লাগল আমার ব্যচেলর জীবনের আকাশে হঠাত ফলিং স্টারের দেখা পেয়েছি , এই মুহূর্তটূকু আমাকে ধরে রাখতেই হবে |
সে জিজ্ঞাসা করলো, ভাইয়া সাদিয়া কি বাসায় আছে?
আমি সম্ভিত ফিরে পেলাম, জিজ্ঞেস করলাম, কোন সাদিয়া?
সে বলল, ভাইয়া, সাদিয়া, ফিলোসফি সেকেন্ড ইয়ার | আমি ওর ফ্রেন্ড |
বললাম, ওহ আচ্ছা ! তুমি ওর ডিপার্টমেন্টেই পড় ?
(ওর নামটা জানা হয়নি এখনো, তাই নিজেই মনে মনে নামটা দিলাম, অহনা, এক্সিস্টেন্স, বার বার মনে হতে লাগল এই মুহূর্তে আমার জন্য ওর এক্সিস্টেন্সটা খুব জরুরী | অত্যাবশ্যকীয় !)
অহনা বলল, নাহ ভাইয়া, আমি কেমিস্ট্রিতে | আমি আর সাদিয়া কলেজ থেকেই ফ্রেন্ড |
এত কাটখোট্টা একটা সাবজেক্ট যে ওর জন্য নয় এটা বলতে গিয়েও বলা হলনা |
- ভাইয়া, সাদিয়া ?
- তুমি মনে হয় জেমিনি তাই না?
- উহু, লিও |
- ওহ, এইটাই ধারণা করা উচিৎ ছিল |
- কেন ?
- লিও ছাড়া এমন আত্মবিশ্বাস কারও চোখে দেখিনি তাই |
এবার সে আমার দিকে তাকালো | চোখে চোখ রাখল | হালকা লাল ঠোটের কোনে হাসি ফুটল | সমুদ্রের সামনে দাঁড়ালে ঠিক যেমন একটা শীতল অনুভূতি হয়, তেমনটা টের পেলাম |
- ভাইয়া, সাদিয়া কি বাসায় আছে ?

- পিরিওডিক টেবিলের ১৫০ বছর পূর্তি উদযাপন করা হবে এই বছর তাই না ?
- কেমিস্ট্রি নিয়ে আপনার আগ্রহ আছে মনে হচ্ছে !
কিভাবে বলি এই মুহূর্ত থেকে আমার সব আগ্রহই তোমাকে ঘিরে !
- ভাইয়া সাদিয়া মনে হয় নেই, আমি পরে আসব |
ওকে আরেকটুক্ষন আটকে না রাখতে পারার ব্যর্থতা আমি মেনে নিলাম |
বললাম, সাদিয়া ঠিক উপরের ফ্লোরে থাকে |
ও ঘুরে চলে যাচ্ছিল, আমি বললাম, আমি কি একদিন তোমার ল্যাবে আসতে পারি ?
ও পেছন থেকেই বলল, কেন ?
বললাম, নামটা জানার জন্য আরেকবার দেখা করাটা খুব জরুরী |
জানিনা এইরকম অদ্ভুত কথায় অহনা হেসেছিল কিনা, তবে ঐদিন দরজার বাইরে ছোট্ট একটা চিরকুট পেয়েছিলাম, লেখা ছিল,
সামনের মঙ্গলবার ১২টার পর ল্যাব শেষে আমি অপেক্ষা করব |
সমুদ্রের শীতল বাতাসের সাথে এবার ঢেউয়ের শব্দ আমাকে ব্যকুল করল | মনে হতে লাগল কবি এই রকম এক মুহূর্তের জন্যই লিখে রেখে গেছেন -
“ প্রহরশেষের আলোয় রাঙা সেদিন চৈত্রমাস
তোমার চোখে দেখেছিলাম আমার সর্বনাশ “

১৬ই ফেব্রুয়ারি, ২০১৯

ভালোবাসা-২

প্রতিদিন সকালে বাইকটাকে ধোয়ামোছা করা অভ্যাস হয়ে গেছে| বিশেষ করে বাইকের সিটটা একটু বেশি সময় নিয়ে পরিষ্কার করি| তুমি একদমই ধুলো পছন্দ করতে না, বাইকে করে যতবার তোমায় নিয়ে বাইরে গেছি ততবার সিটের ধুলো নিয়ে অভিযোগ ছিল|

আচ্ছা এখনও কি ধুলো তোমার অপছন্দের?

মোবাইলটা বেজে উঠলো, স্ক্রিনে ভেসে উঠলো সেই চেনা নাম্বারটা |

আমি বললাম, কেমন আছো ?

ওপাশ থেকে, একটু দেখা করতে পারবে ?

- জায়গা আর সময় তো সব সময় তুমিই বলেছ |

- সময়গুলো কি আর আগের মত আছে ?

- সবই পালটে গেছে ?

- আজ বিকেল চারটা, নদীর ধার ঘেঁষে গাছটার নিচে | পারবে ?

- জায়গাটা আজও তোমার পছন্দের! অপেক্ষা করব|

নীল রঙটা আমার পছন্দ বলে ও প্রায়ই নীল জামা পরত | ওকে তাতে মানাতও বটে | আজও পরেছে | চোখের নিচে কালো দাগটা দেখেই বোঝা যাচ্ছে ঘুম পাগলি মেয়েটার না জানি কত রাত না ঘুমিয়েই কেটেছে |

ও বলল, প্রথম মনে হয় সময় মত আসলে |

বললাম, এই কয়দিনে বেশ শুকিয়ে গেছো !

- দের বছর

- হঠাথ মনে পড়ল যে?

- তোমার বাইকে একটু ঘোরাবে ?

বাইক চলছে | দুজনা কতক্ষণ চুপ করে ছিলাম জানিনা |

হঠাত ও বলল , আমাকে মনে পরে তোমার ?

- সেদিনের পর থেকে দুঃস্বপ্ন দেখে রাতে ঘুম ভেঙ্গে যাওয়ার সমস্যাটা পেয়েছি জানত |

- তাহলে আটকালে না কেন সেদিন ?

- চেয়েছিলাম , অনেক করেই চেয়েছিলাম, কিন্তু পারিনি |

- বেশ ভালই তো আছো | দারিতে তোমাকে মানিয়েছে , সাথে নতুন ফ্রেমটাও |

- নতুন একটা জব পেয়েছি, স্যালারি মোটামোটি চলে যায়| তবে তোমার বরের মত এত না|
- বিয়েটাইতো হল না (মেকি একটা হাসি দিলো ও)
তারপর আরও কিছুখন আবারও দুজনাই চুপ|
বললাম, আমার স্যালারি দিয়ে কিন্তু দুজনার সংসার দিব্বি চলে যাবে এখন|
বুঝতে পারলাম ফোঁটা ফোটা জলে আমার সার্টটা ভিজছে| ওর সাবধানী হাত দিয়ে আমার কোমর শক্ত করে ধরেছে| বুঝতে পারছি আমার চোখটাও ঝাপসা হচ্ছে| বাইকটা এবার সাইড করতে হবে|

১৬ই ফেব্রুয়ারি, ২০১৯

ভালোবাসা-৩

হ্যালো...হ্যালো...হ্যালো...
কি হলো...
শুনতে পাচ্ছোনা তুমি?
ওরা আমাকে আজ দেখতে আসবে... অনেক কষ্ট করে নীতার ফোন থেকে ফোন করছি
কি হলো...
শুনতে পাচ্ছোনা ... তুমি...
কিছু একটাতো বলো...
অটো রিসিভ অপ্সানটা তুমিই অন করে দিয়েছিলে আমি ফোন ধরতে দেরি করি বলে | তাই ফোনটা রিসিভ হওয়ার সাথে সাথেই ওপাশ থেকে তোমার কথাগুলো ভেসে আসতে লাগল |
তুমি বলে চললে, সরি বলেছিতো কতবার, শেষবারের মত মাফ করে দাও প্লিজ | দেখো আমি সত্যিই কান ধরছি | হ্যালো , কোন কথা বলছ না কেন ?
ভেজা চোখে তোমার কথা শুনে যাচ্ছি |
আচ্ছা শোনো, আমি জানি রাগ হলে তোমার মাথা ঠিক থাকেনা, কখন কি করে বসো তার ঠিক নেই | এইবারের মত প্লিজ মাথা শান্ত কর | জানি এই সময় তুমি কোন কথাও বলনা | আচ্ছা, রাতের ওষুধটা খেয়েছো তো ? অবশ্যই খালি পেটে খাবেনা কিন্তু |
আমি মনে মনে বললাম, এত কিছুর পরেও বরাবরের মতই আমার খোঁজটা তুমি রাখতে ভুলোনা !
তুমি বলছ, আচ্ছা আমরা যদি পালিয়ে যাই তবে কেমন হয় ? নিতার কাছে সাহায্য নিয়ে আজ রাতেই বের হই ? তারপর দূরে কোথাও গিয়ে বিয়েটা সেরে ফেলি | তোমার আমার পেট চালানোর মত দুজনা যদি কিছু করি দেখবা দিব্বি চলে যাবে | তারপর কিছুদিন বাদে যখন ফিরে আসব দেখবা সব ঠিক হয়ে গেছে | তারপর আমাদের ছোট্ট সংসারে ছোট ছোট স্বপ্নগুলো একসাথে বুনব | তুমি নিশ্চয় হাসছ ?
হুম আমি হাসছি, চাপা হাসি | যে হাসিতে দুঃখ লুকিয়ে থাকে | যে হাসিতে বুকে মোচর দেই |
বলছ, তুমিকি বিয়ের পরেও এত রাগ করবে ? তখনো রেগে চলে যেতে চাইবে ? যদিও তুমি কখনো পারবেনা জানি |

তুমি আর কতক্ষণ রাগ করে থাকবে বলবে ? দেখো সব ঠিক হয়ে যাবে, সব
| জানত তুমি আমাকে স্বপ্ন দেখতে শিখিয়েছ | সব কিছুতেই এখন আমি
আশাবাদী | আর সাথে তো তুমি আছই |
আমার শরীরটা ঝুলছে ঘরের সিলিং ফ্যানটা থেকে | মুখ দিয়ে ফেনা বের হয়ে
শুকিয়ে গেছে | ফোনটা থেকে তখনো আওয়াজ ভেসে আসছে |
চোখজোড়া তখনো ভেজা |

১৬ই ফেব্রুয়ারি, ২০১৯

পিঁপড়া

নজরুল সাহেবের হাত ঘড়িতে এখন দেড়টা বাজে | বড় সাহেবের ডাক পরতেই তড়িঘড়ি করে সে হাতের আস্তিন গুটিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসলেন | অফিসের স্টাফদের মধ্যে তিনিই বেশ কর্মঠ আর সৎ | বসের রুমে তার ডাক পড়েছে তিন মিনিট উনপঞ্চাশ সেকেন্ড আগে | কাজের বেলায় তিনি এতটাই পাঞ্চুয়াল যে সব কাজ ঘড়ি ধরেই করেন | চায়ের সাথে বিস্কিট খেলে কতটুকু এক্সট্রা সময় লাগতে পারে সে হিসেব করেই তিনি দুইটি বা তিনটি বিস্কিট নেন | তার এহেন কর্মনিষ্ঠার জন্যই তার উপর এসে পরে বড় বড় কাজগুলো | এতে তার আনন্দের শেষ থাকেনা | তাকে যদি বলা হয় , "নজরুল ভাই, এত যে কাজ করেন সেই মত তো ইঙ্ক্রিমেন্ট পান না, আপনার খারাপ লাগেনা ?" তখন নজরুল ভাই এক গাল হেসে বলেন, আরে ভাই, কাজ তো করি ভালোবেসে, আর ভালোবাসার জিনিস কি অর্থ দিয়ে মূল্যায়ন করা যায় !? নজরুল ভাইয়ের মত কর্মকর্তার জন্যই যে আজ নেপচুন এন্টারপ্রাইজ টিকে আছে এটা কোম্পানির সবাই স্বীকার করে |

নেপচুন এন্টারপ্রাইজের কর্ণধার শাহাদাৎ সাহেব | এমন রাশভারী আর তিরিক্ষি মেজাজের লোক মনে হয় পৃথিবীতে তিনি সাত নাম্বার | দিন শেষে যদি কিম জং ভাল মানুষের খেতাব পান তাও শাহাদাৎ সাহেব পাবেন না | তার মাথার মসৃণ টাক টা ছাড়া পৃথিবীতে মনে হয় আর কিছুই তিনি সহ্য করতে পারেন না | তবে তার চরিত্রের এই ডার্ক সাইডটা তাকে প্রথম দেখায় বোঝা যায় না | শাহাদাৎ সাহেবের হালকা গোঁফের রেখাটা টিনেজারদের মত মায়ার আকর্ষণ তৈরি করে তার স্রোতাদের কাছে |

রামপুরার বিশাল জ্যাম ঠেলে নজরুল সাহেবের বাসায় ফিরতে বাজে ১০ টা | হোটেলে বলা থাকে | তিনি আসা মাত্রই তার জন্য খাবার চলে আসে তার রুমে |
নজরুল সাহেবের একটা স্বভাব হল তিনি ঘরে ঢুকেই সোজা টেবিলে খেতে বসবেন | আজও তাই করলেন | খেতে বসে দেখেন তার ভাত আর তরকারির বাটির ঠিক মাঝখানটাই ছোট একটা টিকটিকি গুটি মেরে বসে আছে | বাটিটা সরাতেই ওটা পালিয়ে গেল | এমন ঘটনা এই নিয়ে চারবার | তবে টিকটিকির জায়গায় তেলাপোকা পেয়েছেন দুইবার | এই ব্যাপারটা নিয়ে তিনি কখনই হোটেল ম্যানেজারকে নালিস দেননি | তার কথা হল - এই নিরীহ জীব গুলো যদি তার সুবাদে সামান্য কিছু ভাল খাবার খায় তবে তো তার কম পরছেনা |
খাওয়া শেষ করে প্যান্ট ছেরে লুঙ্গি পরতে গিয়ে প্যান্টের পকেট থেকে ছোট ছোট কিছু পিঁপড়া বের হতে দেখলেন |

এরপরই পকেট থেকে আধ খাওয়া বিস্কিটটা পেলেন। কিছুতেই মনে করতে পারলেননা এটা কখন রেখেছেন ! নিয়ম মত টানা আদা ঘণ্টা শাওয়ারের নিচে দাড়িয়ে থেকে ভাবলেন সারাদিনে অফিসের কাজে কোন ভুল করেছেন কিনা। আধ ঘণ্টা পরে যখন তার চিন্তায় কোন ভুল ধরা পরলনা দেখলেন তিনি শাওয়ারের নব ঘোরাতেই ভুলে গেছেন। সুতে দেরি হলে আগামিকাল অফিসে যেতে দেরি হতে পারে এই ভেবে তার আর নব ঘুরিয়ে গোসল করাটাই হল না।

নজরুল সাহেবের ঘুম নিয়ে তেমন সমস্যা হয় না যদিনা অফিস নিয়ে কোন দুঃস্বপ্ন দেখেন। এছাড়া এক ঘুমেই রাত পার করে দেন। কিন্তু আজ রাতে হঠাত করেই তার ঘুম ভেঙ্গে গেল। কয়টা বাজে ঠিক বুঝতে পারছেন না কারন ঘর একেবারে ঘুটঘুটে অন্ধকার। ঘুম ভাঙার কারন ভাবতে গিয়ে দেখলেন তার বাম হাতের কবজি থেকে খানিকটা অংশ চিনচিন করছে। মনে হচ্ছে ছোট কিছু প্রাণী জট পাকিয়ে আছে। হাতরে ফোনটা বের করে দেখলেন সেটা অফ হয়ে পরে আছে। কোন মতে একটা দেয়াসলাই বের করে এক পসলা আগুন ধড়িয়ে হাতের সামনে আনতেই আঁতকে হাতের কাঠিটা ফেলে দিলেন। তিনি দেখলেন বিশ্রী রকমের বেশ ছোট কিছু পিঁপড়ার মত প্রাণী তার হাতে জট পাকিয়ে কিলবিল করছে। এটা দেখার পর তার মনে হতে লাগল অসম্ভব যন্ত্রণায় তার হাতটা ছিরে যাচ্ছে। কোন মতে বাথরুম গিয়ে হাতের কবজি পর্যন্ত পানিতে ডুবিয়ে রাখলেন। মনে হল কিছুটা শান্তি পেলেন। হাতের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই ঘুমিয়ে পরলেন নজরুল সাহেব।

রোদের ছটা এসে অনেকক্ষণ থেকেই মুখে পরছিল। প্রচণ্ড চিনচিনে ঘার ব্যথা নিয়ে ঘুম ভাঙতেই দেখলেন বাথরুমে উবু হয়ে বসে আছেন। গত রাতের ঘটনাটা মনে পরতেই হাতের দিকে তাকালেন। অবাক হয়ে দেখলেন গতরাতের কোন রকম চিহ্ন নাই। একটা খারাপ স্বপ্ন ভেবে ব্যপারটা উড়িয়ে দিয়ে অফিসের জন্য তৈরি হতে লাগলেন। প্রতিদিনের সেই গদ বাধা রুটিনে আবার মনোযোগী হলেন নজরুল সাহেব।

সারাদিনের পরিশ্রমে গতরাতের স্বপ্নের কথা ভুলেই গেলেন। দিন শেষে আবারও সেই বাড়ি ফেরা। ক্লান্ত ঘরে হোটেলের খাবার, টিকটিকি, আধ ঘণ্টার গোসল। তার এই এক ঘেয়ে রুটিনে স্রষ্টাও মনে হয় বিরক্ত হয়েই গত রাতের স্বপ্নটা দেখিয়েছিলেন।

আজ রাতেও নজরুল সাহেবের ঘুম ভেঙ্গে গেল। আগের দিনের মতই একইরকম চিনচিনে ব্যথা। তবে আজকে পায়ের গোড়ালি থেকে হাঁটু অব্দি আর গত দিনের থেকে ব্যাথাটা বেশি মনে হচ্ছে। তিনি মন কে বোঝাতে চেষ্টা করছেন গত রাতের মত আজও স্বপ্ন দেখছেন। খুব খারাপ একটা স্বপ্ন। ঘুম ভাঙলেই দেখবেন সব ঠিক আছে। কিন্তু শরীরের ব্যথা মনের বুঝ দিয়ে মানাতে পারলেন না। দৌড়ে পানিতে পা চুবিয়ে বসে থাকতে থাকতেই ঘুমিয়ে পরলেন।

সকালে বাথরুমে আধ শোয়া অবস্থাতেই ঘুম ভাঙল। গত দিনের মত আজও রাতের ঘটনার কোন চিহ্ন নাই।
সারাদিন অফিসে কাজে মন দিতে পারলেন না। থেকে থেকেই গত রাতের ঘটনা মনে পরতে লাগলো। তিনি বুঝে উঠতে পারছেন না তার সাথে কি হচ্ছে।

এই ভাবেই প্রতিটা রাত কাটছে। ঠিক একই সময় ঘুম ভেঙ্গে যায়। ব্যথা আগের থেকে অনেকটা বেড়েছে। তীব্র যন্ত্রণায় মুখ দিয়ে লালা পরে। একেক দিন শরীরের একেক জায়গায় প্রাণীগুলো আক্রমণ করে। পানিতে গেলেই সব ঠিক।
তার এই কথা গুলো কাওকে বলতেও পারছেন না। কি বলবেন ? প্রমাণ কি ? একেবারেই যে বলেন নি তা না , বলার চেষ্টা তিনি করেছেন তবে ফল হয়েছে উল্টা। যাদের বলতে গেছেন তারা বলেছেন নজরুল সাহেব কাজের চাপে পাগল হয়ে যাচ্ছেন। অফিসে এই নিয়ে কানা ঘুষাও শুরু হয়েছে। হবে নাই বা কেন ! যে নজরুল ভাই সারাজীবন অফিসের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন, কখনো এক মিনিট দেরিতে আসেন নি , সেই নজরুল সাহেব এখন প্রায় দেরি করে আসেন বলে বসের কাছে বকা খাওয়াটা নিয়ম হয়ে গেছে, অফিস কামায়ের জন্য তার বেতন থেকে টাকা কাটা হচ্ছে, কাজে মন থাকেনা, সব সময় কি যেন চিন্তা করেন।

নিজে বুদ্ধি করে নজরুল সাহেব পুরান মার্কেট থেকে একটা বাথট্যাব কিনেছেন। সেটাতে পানি ভর্তি করে রাতে ওর মধ্যে ঘুমান। এতে ভাল ফল পাচ্ছেন। ব্যথা শুরু হলেও কিছু বাদেই কমে যায়। পানিতে ঘুমানোটা তিনি মজা পাচ্ছেন। শুধু কখন পানিতে নামবেন এই ভেবেই ইদানীং দ্রুত বাসায় চলে আসেন। তিনি ভাবলেন তার সাথে যেটা হচ্ছে সেটা স্বপ্ন হোক কিংবা বাস্তব, তার জন্য সাপে বর হয়েছে। তার এক ঘেয়ে জীবনের ছন্দে পরিবর্তন এসেছে।
তবে বিপদ যে হয়নি এমন না। সেদিন রাতে ব্যথাটা মাথায় শুরু হওয়াতে বাথ ট্যাবে ডুব দিলেন, অথচ ভুলেই গেলেন যে তিনি জীবনে কখনই পুকুরে নামেননি। অনেকটা দম আঁটকানোর জোগার হয়েছিল।

প্রতিদিনের স্বপ্ন টাকে বাস্তব কিংবা বাস্তবটাকে স্বপ্ন ভেবে নিয়ে নজরুল সাহেব জীবন কাটাতে লাগলেন।
আগামীকাল নজরুল সাহেবের জন্মদিন। এই দিনটা উদযাপন করার কথা কখনই মনে হয়নি। কিন্তু এবার মনে হচ্ছে। তিনি বেশ কিছু মোমবাতি কিনে এনেছেন। সাথে ছোট তিনটা পিস কেক। সাদা ক্রিম দেয়া কেকের উপর লাল বর্ডার টানা। দেখতে বেশ লাগছে বলেই তিনটা কিনে ফেললেন। একটা খাবেন বাকি গুলো রেখে দেবেন তার টিকটিকি আর তেলাপোকার জন্য।

আজ আশ্বিনে পূর্ণিমা| বাথরুমের ছোট্ট জানালাটা দিয়ে চাঁদের আলো পড়ছে পুরনো বাথ ট্যাবের পানিতে| পানি জলজল করছে| দু হাত তুলে ডাকার মত নজরুল সাহেব কে ডাকছে| বাথ ট্যাবের চারপাশের খুব যত্ন করে মোমবাতি গুলো জ্বালিয়েছেন তিনি | ইলেকট্রিক বাতিটা নিভিয়ে দেয়াই মোমবাতি আর চাঁদের আলোয় স্বর্গীয় পরিবেশ তৈরি হয়েছে| কেন জানি নজরুল সাহেবের বেশ খুশি লাগছে| অন্যরকম এক ভালো-লাগা কাজ করছে| মনে হচ্ছে তিনি কারও জন্য এই পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন , তিনি আজ রাতেই আসবে| এসে নজরুল সাহেব কে জরিয়ে ধরে থাকবে| তার জন্মদিনের শুভ কামনা জানাবে তাকে কানেকানে|
সব আয়োজন শেষ করে ছোট একটা ফেটে যাওয়া কাঁচের প্লেটে দুইটা কেক এনে বাথ ট্যাবের পাশেই রাখলেন| দুইটা কেন আনলেন তিনি জানেন না| কিংবা হয়ত জানেন কিন্তু বুঝতে দিতে চাইছেন না|
আজ নিয়মের খানিকটা পরিবর্তন করে ধোয়া কাপড় পরে বাথ ট্যাবে নামলেন| জানালা দিয়ে হালকা বাতাস আসছে| ধিরে ধিরে বসে পানিতে শরীর এলিয়ে দিলেন| শেষ কবে এত আনন্দ নিয়ে ঘুমুতে গেছিলেন তার মনে পরছেনা| চোখ বুঝলেন| চাঁদের আলো তার মুখে চুমু খেয়ে যাচ্ছে|
তীব্র যন্ত্রণায় ঘুম ভাঙল| তিনি এটাই অভ্যস্ত| তিনি জানেন এই যন্ত্রণা কিছু বাদেই তার ঘুমের সাথে মিলিয়ে যাবে| পর পর তিনবার বললেন - এটা স্বপ্ন, এটা স্বপ্ন, এটা স্বপ্ন| ব্যথা আরও বাড়ছে| চাঁদের আলোয় তার সারা শরীর ঢেকে আছে| তিনি অবাক হয়ে পোকা গুলোকে খুঁজে পেলেন না !
তবে কি তারা আজ আসেনি ? তবে এত যন্ত্রণা কেন হচ্ছে ?
বুঝতে পারলেন পোকাগুলো আজ তার শরীরের মধ্যে ঢুঁকে পড়েছে| তার মাথার ভেতরের অংশে ওগুলো তীব্র শব্দ করছে| তার মস্তিষ্ক চিবিয়ে খাচ্ছে|
নজরুল সাহেব সহ্য করতে পারছেন না| ব্যথায় কুঁকড়ে যাচ্ছেন| তার চোখ দিয়ে পানি পড়ছে|
আজ নজরুল ভাইয়ের জন্মদিন| তার পাশেই দুইটা কেক রাখা আছে| তার জন্য আজ কেও আসবে| তাকে জরিয়ে ধরে কানেকানে তার জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাবে| চাঁদের আলো কি তাদের দুজনার শরীর ঢাকতে পারবে ?
হটাত করেই তার সব ব্যথা মিলিয়ে যাচ্ছে| মুখ দিয়ে লালা বাথ ট্যাবের পানিতে পড়ছে| তার নাক থেকে গরম রক্ত বের হচ্ছে| পানি লাল হয়ে যাচ্ছে | তীব্র লাল| চাঁদের আলোতে লাল জল কে আরও তীব্র দেখাচ্ছে| নজরুল ভাইয়ের এটা দেখতে বেশ ভাল লাগছে|

আজ নজরুল ভাইয়ের জন্মদিন| তিনি চোখ বুঝলেন|

বাথ ট্যাবের পাশে একটা মোমবাতি মেঝেতে মিসে যাওয়ার আগে শেষ অংশটুকু জ্ব-লছিল| তার টিকটিকিটা এসে একটা কেকের গায়ে লেপটে থেকে নজরুল ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে আছে| ছোট এই জীবটাও হয়ত প্রকৃতির এই খেলা উপভোগ করছে|

২রা জুলাই ২০২১ ॥ রাজশাহী

অতিপ্রাকৃতের খোঁজে

মোটা কালো ফ্রেমের চশমাটা চোখেই লাগানো ছিল | জ্ঞান ফিরতেই বড় একটা আ-লোর ঝলকানি চোখে এসে পড়ল |

আমি তূর্য | কোন এপ্লিকেশনে যখন বিশেষ চিহ্ন উল্লেখ করতে হয় সেই ছোট থেকেই লিখে আসছি বা চোখের পাশের দাগটার কথা | ছোট বেলায় সামান্য কারনে পরে গিয়ে সেলাই পরেছিল | দাগটা এখন অনেকটাই মিলিয়ে গেছে, তারপরেও কেন জানি লিখি | মুখ ভর্তি একগাদা দারি রোগা শরীরের সাথে মানিয়ে গেছে | কৈশোরের গরম রক্ত যৌবনে যেন টগবগ করে ফুটছে | নতুন নতুন অভিজ্ঞতা নেয়ার জন্য প্রতিদিন বাসা থেকে বের হয়ে যাই | অতিপ্রাকৃত জিনিসের প্রতি কেমন যেন একটা আকর্ষণ কাজ করে | নিজে বিশ্বাস না করলেও কোথাও কোন গল্প পেলেই বসে পরি | সামান্য ছুতা পেলেই দেশের যে কোন প্রান্তে ছুটে যাই “ভুত” দেখতে | আমার ধারণা সব কিছুই যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দেয়া সম্ভব |
ময়মনসিংহ থেকে একটু ভেতরের এক গ্রামে দূর সম্প র্কের আত্মীয়ের বিয়ের খবর-টা যখন পেলাম ব্যাগ গোছাতে এক মুহূর্তও দেরি করিনি | সঙ্গত কারণেই গ্রামের নাম উল্লেখ করছিনা |
 রাতের বাস ধরেই রউনা দিলাম | ভোর থাকতে থাকতে পৌছে দেখি মফস্বলের বিয়ের ছোট খাট আয়োজন বেশ ভালই চলছে | আসার পর থেকে সারাটা দিন ব্যাস্ত তার মধ্যেই কেটে গেল | দুপুরের মধ্যে বিয়ে শেষ হল আর বাকি আয়োজন শেষ হতে মোটামোটি সন্ধ্যা হল | একটা জমাট আড্ডা শেষ করে একটু রাত করেই মনের ভেতরের আকাঙ্খা পুরনে কাওকে না জানিয়েই বের হলাম | উদ্দেশ্য শ্মশান যাওয়া | বেশ খানিকটা পথ | সন্ধ্যা হয়ে যাওয়ায় কোন রিক্সা ওদিকটায় যেতে চাইছিল না | একজনকে অনেক অনুনয় করার পর দিগুণ ভারার লোভেই যেতে রাজি হল | স্ট্রিট লাইট না থাকাই পুরো পথটাই অন্ধকারে ছেয়ে আছে | জমাট কালো অন্ধকারের মাঝে মাঝে থোকা থোকা জোনাকি দল বেধে পথ দেখাচ্ছে | মাঝে মাঝে দূরে শেয়ালের ডাকে গা ছমছম করছিল | রিকশাওয়ালার সাথে গল্প করতে করতেই প্রায় আধা ঘণ্টা লাগল পৌছাতে | রিক্সাভারা মিটিয়ে নামার সময় সে আমি না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে চাইল দেখে ভীষণ অবাক হলাম |
যেখানে নামলাম তার চারপাশেই জংলা | পায়ে হাটা পথ যেদিকটা দিয়ে গেছে তার সামনে দুইটা ভাঙা পিলার বেশ কষ্ট করেই দারিয়ে আছে | বোঝা গেলো এটাই শ্মশানে ঢোকার পথ |

ছোট একটা চাপড়া ঘরের সামনে মৃদু আলোয় হ্যারিকেন জলছে | বোঝা যাচ্ছে দারোয়ান বা ডোম গোছের কেও থাকে এখানে | স্বাভাবিক ভাবেই শ্মশানের পরিবেশটা কেমন যেন গা ছমছম করার মত | হঠাথ কাধে একটা হাত পরতেই চমকে উঠি | আমার অবস্থা টের পেয়ে তিনি নিজ থেকেই শ্মশানের ডোম পরিচয় দিল | নাম সাগর | মাঝ বয়সী | আমার আসার কারন আর আগ্রহ দেখে সে তার অভিজ্ঞতা বলা শুরু করল | বোঝা গেলো কথা বলার মানুষ পায় না বলে আমি আসাতে সে বিরক্ত হয়নি | তার কথায় জানতে পারলাম সে নাকি এ পর্যন্ত ৩০০ এর অধিক মরা পুড়িয়েছে | এরপর সে একটা অদ্ভুত ঘটণা বলল | তার কথা হুবুহু তুলে দিচ্ছি ;

এখানে যে ছোট একটা ঘর দেখছেন ওখানেই থাকি | কখন কার দরকার পরে বলেই এখানে থাকতে হয় | এই জায়গায় গত ১০ বছর যাবত আছি বলে প্রতিটা শব্দ আমার চেনা | সেদিন অমাবস্যা ছিল | বাইরে কিছু কাজ সেরে শ্মশানে ফিরেছি | ঘরে এসে মাত্র খাওয়া শেষ করে বিছানায় গেছি | অদ্ভুত একটা আওয়াজ কানে আসলো | মনে হল দুইটা বাচ্চা কাঁদছে | প্রথমে শেয়ালের শব্দ বলে মনে হলেও বেশি দেরি হলনা নিজের ভুলটা ভাঙতে | অবাক হয়ে খেয়াল করলাম শব্দটা আমার ঘরের পেছনের আম গাছটা থেকেই আসছে | কেমন যেন একটা করুণা আর আকুতি ছিল সেই শব্দের মধ্যে | বেশ খানিকটা পরে থেমে গেল | ঘটনাটা প্রায় প্রতি রাতেই ঘটতে লাগল | প্রতিদিন শুনেও না শোনার ভান করি | এরপর একদিন একটা টঙ্গের দোকানে বসে চা খাচ্ছি | আমার সামনে কিছু লোক গল্প করছিল | কানে আসল তারা দুই বাচ্চার কথা বলাবলি করছে | ঘটনা মিলে যেতেই তাদের কাছে গিয়ে বিস্তারিত জানতে চাইলাম | তারা জানাল আমাদের গ্রামের ইয়পর দিয়ে যে নদী গেছে তার পাশেই ছোট একটা ব্রিজের ধারে কিছুদিন আগে দুইটা বাচ্চার লাশ পাওয়া গেছে | তখন থেকেই নাকি রাত হলেই এলাকায় এরকম বাচ্চার কান্নার শব্দ শুনতে পাওয়া যায় | দ্রুত শ্মশানে এসে বাচ্চা দুইটার আত্মার শান্তির জন্য কিছু পুজা করলাম | এরপর থেকে এরকম ঘটনা আর ঘটেনি |

সাগর দার সাথে গল্প করতে করতে কতটা সময় পার হয়ে গেল টের পায়নি | বাড়িতে ফেরার কথা বলতেই তিনি এগিয়ে দিতে আসলেন | রাস্তা পর্যন্ত তখনও আসিনি তার আগেই এমন এক ঘটনা ঘটল যেটার জন্য আমি মোটেও প্রস্তুত ছিলাম না | রাস্তার ঠিক ওপার থেকে হাতে টর্চ নিয়ে একজন লোক এগিয়ে আসছিল | আলোর ঠিক বিপরীতে ছিল বলে মুখটা দেখতে পাচ্ছিলাম না | কিন্তু খেয়াল করলাম লোকটাকে দেখা যাওয়ার পর থেকেই সাগর দা আর কথা বলছিল না | লোকটা কাছে আসতেই আমি নির্বাক হয়ে গেলাম | দেখি এতক্ষন যে সাগর দা আমাকে গল্প শোনাচ্ছিল সেই আমার সামনে দারিয়ে আছে | আমাকে অবাক করে দিয়ে সে আমার কাছে জানতে চাইল আমি কে আর কি চাই | কথার ধরন একদম এক | কিছুতেই নিজের চোখ আর কানকে বিশ্বাস হচ্ছিল না | আমি জ্ঞান হারালাম |

জ্ঞান ফিরতেই বড় একটা আলোর ঝলকানি চোখে এসে পরে| সামনে দেখি সাগর দা দারিয়ে আছে| তাকে সব খুলে বললাম| শুনে সে মোটেও বিস্মিত হলেন না বরং সে জানাল এমনটা নাকি আগেও হয়েছে|
ওই রাতেই বাস ধরে ব্যাক করি|
সেই রাতের ঘটনা কাওকেই বলিনি| উত্তর খোজার চেষ্টা করেছি অনেকের কাছে| যে যার মত ব্যাখ্যা দিয়েছেন| অনেকে বলেছেন আমি হালুসিনেসান করছি|

থাকনা প্রকৃতির কিছু নিজস্ব গোপন কথা| সেগুলো নাহয় রহস্যই থাক|
আমি তূর্য| আমি অতিপ্রাক্রিতিক ঘটনায় বিশ্বাস করিনা| বিশ্বাস করি প্রকৃতির রহস্যে| ভালোবাসি সেগুলো খুজে বেরাতে| নিজের চোখে সেগুলো দেখতে| তাই ওই ঘটন-ার দু বছর পর আবারো ফেরত গেছিলাম সেই গ্রামে- সেই শ্মশানে| সেই গল্পটা নাহয় হবে আরেকদিন|

১৫ অক্টোবর ২০১৯ ॥ ময়মনসিংহ

অধুনা আধুনিকতা

বাংলা অভিধানে "আধুনিকতা" শব্দটার রিপ্লেস্মেন্টের সময় এসে গেছে বোধ হয়। এখন আধুনিকতা আর উস্রিঙ্খলতার মধ্যে খুব একটা ফারাক দেখা যায়না। যা উস্রিঙ্খল তাই আধুনিক , কিংবা তার উল্টোটাও বটে। ব্যাক্তিগত অভিমতে বলা যেতে পারে নাইন্টিসের পরের জেনারেশন থেকে খুব দ্রুত আর বড় গ্যাপ তৈরি হয়েছে আর হচ্ছে। সেটা নৈতিকতার হোক কিংবা চরিত্রের আর ব্যাবহারেরই হোক। এই শব্দগুলো এখন নাকি তাদের কাছে দাত ভাঙ্গা বাংলার মত লাগে যেটা বাংলা এক্সামে বেশি মার্ক্স পেতে ব্যাবহার করা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। এক্সামে আসা "প্রযুক্তির অপব্যাবহার রোধে করনীয়" প্রশ্নের উত্তরে সকলেই তারা হাইয়েস্ট মার্ক্স পাবে তবে সেগুলো প্রাক্টিকালি দূর করতে কেও এগিয়ে আসবেনা। ফেবুতে সুন্দর সুন্দর কথাগুলো শেয়ার দিতে সবাই ব্যাস্ত, অথচ কারও সময় নেই সেগুলো মনে ধারন করার। কথার মাঝে দু একটা খিস্তি না দিলে নাকি স্মারটনেসটা ঠিক জাহির করা যায়না। চুলগুলো রাঙিয়ে নিয়ে ঈশ্বরের ভুল শুধরাতে তারা সবাই ব্যাস্ত।

সবাই বর্তমানে বাঁচতে চাই। অথচ ভুলে যায় আগামি দিন আজকের বর্তমানের প্রভাব নিয়েই হাজির হবে। মিথ্যার সাথে বন্ধুত্ব না করে সত্যিটাকে আঁকড়ে ধরলেই অনেকটা পথ সহজেই পার হওয়া যায়। নয়ত মিথ্যা নামক বন্ধুর সংখ্যা দিন দিন বারতেই থাকে , চাপা পড়তে থাকে সত্যের আকাশটা। মুখোশের দাম খুব বেশি সস্তা হয়ে গেছে, অনেকটা রাস্তার পাশের ওসব কমদামি স্টারলাইটের এনার্জি বাল্বের মতই। কারণ আসল চেহারাটা লুকাতে সব্বাই ব্যাস্ত। নকল চেহারায় জিতলে পুরস্কার , নয়ত তিরস্কার। এ আর এমন কি ! যখন এই মুখোশের আরালে তাসের ঘরের মত সম্প র্কগুলো ভেঙ্গে যায় সবার মনে একটাই প্রশ্ন থাকে, এত দ্রুত সব শেষ হয় কিভাবে ? অথচ কেও দেখেনা যেটার শুরু হয়েছিল সন্মান থেকে সেই সন্মান্টাই হারিয়ে যায় মুখোশ আর মিথ্যার আরালে। নতুন উক্তির জন্ম হয় , ভালোবাসা অর্জনের থেকে রক্ষা করা কঠিন।

কারও মধ্যে ভুল করে "ভালো স্বভাব" গুলো দেখা গেলে তাকে নাটক কিংবা সিনেমার চরিত্রের সাথেই তুলনা করা হয়ে থাকে , ব্যাপারটা খুব বিরল তাই। অথচ ভালো স্বভাবটাইতো কাম্য ছিল সবার থেকে তাই না ?

এসব ক্ষেত্রে পরিবারের দোষ থেকে যায় অনেকটাই | বাঙালি শারীরিক ভাবে বেশ শক্ত পোক্ত | ছোট থেকে একটু কঠোর শাসন (প্রয়োজনে চর থাপ্পড়) আর অনুশাসন থাকলে হয়ত অনেক কিছুরই সমাধান করা যায় | বাঙালি ডান্ডায় ঠাণ্ডা কিনা ! দরকার হলে পরিবার পরিকল্পনার পাশাপাশি সন্তান লালন পালনের উপর একটা ছোট খাটো কোর্স করাটা বাধ্যতামূলক করা যেতে পারে, যার তদারকি করবেন বিখ্যাত বৃদ্ধ/বৃদ্ধা ব্যাক্তিবরগের একটা দল | গোরায়গন্ডগোল রেখে লাভ আছে ? কৃতকর্মের ফল সেই সন্তানের পাশাপাশি পরিবারকেওতো বয়ে বেরাতে হবে তাই না ?
পরিবারটাই সব | তাদের প্রতি সন্মান্ টাই সব | স্বপ্ন দেখাটাই সব | স্বপ্ন নিয়ে বাঁচাটাই সব | সবাইকে সাথে নিয়ে চলাটাই সব | সত্যিটাই সব | ফেবুতে বাবা মাকে নিয়ে লোক দেখানো লেখা শেয়ার করার সময় টুকু যদি তাদের কাছে গিয়ে জরিয়ে ধরে কাটানো যায় তবে সেটাই সব | মায়ের দিকে তাকিয়ে তার কোলে মাথা রেখে ঘুমানোটাই সব | বাবার পাশাপাশি হেটে রাস্তাটা পার হওয়াই সব | প্রতিটা সম্প র্কই পবিত্র হোক | মন থেকেই গড়ে উঠুক স্বপ্ন বৃক্ষ গুলো | সত্যের কাছে পরাজিত হোক সকল মিথ্যা জঞ্জাল |

২০ অক্টোবর ২০১৬ | চট্টগ্রাম

ধর্ম - মনের খোরাক নাকি বেশি কিছু ?

ঈশ্বর প্রীতি নাকি ঈশ্বর ভীতি ?
প্রতিকী বেশ-ভুসা আর কিছু শব্দের মাধ্যমে কতটুকু ঈশ্বরের কাছা কাছি যাওয়া সম্ভব!!!
তাকে ভালোবাসতে কি একটি সুন্দর মনই যথেষ্ট নয়?
হা ঈশ্বর ! তোমার নামে যেসমস্ত প্রোপাগান্ডাই আজ ফেসবুক ছেয়ে যাচ্ছে সেগুলো সম্প র্কে কি তুমি অবগত ? জানতে ইচ্ছে করছে , আমার আশু বিপদ জেনেও যে মেসেজগুলো আমি কাওকেই পাঠাচ্ছিনা সে ব্যাপারে তুমি আমার কি কি শাস্তি ঠিক করে রেখেছ ?
তুমিকি জানো আজ উপাসনালয়ের চেয়ে ফেসবুকেই তোমার সর্বাধিক উপাস-না করা হচ্ছে ! খারাপ লাগছে এটা ভেবে যে , তুমি তোমার সৃষ্ট মানবজাতির মতই সামান্য লাইক পেয়ে খুশি হয়ে যাচ্ছ ! আজ কেও মারা গেলে কিংবা মুমূরশ রুগীর জন্য প্রাণ ভিক্ষা চাওয়া হয় ফেসবুকে , ওসমস্ত উপাসনালয় গুলোতে আর কজন যায় ? ওগুলতো আর ডিজিটাল না ! তাছারা ওখানে খুব একটা শর্টকাটেও কাজ সেরে আসা যায় না বটে | তাছারা মানুষ দেখানোরও একটা ব্যাপারতো থেকেই যায় |
কি আশ্চর্য ! শেষমেশ স্বর্গের গণ্ডী পেড়িয়ে আজ তুমি ফেসবুকে ! একজন নাস্তিকের তৈরি ফেসবুকে ! তাহলে কি মানবকুল আজ মৃত্যুর পর যেন ফেসবুকেই থাকতে পারে সেরকম প্রার্থনা সুরু করে দিবে ? তুমিই বলে দাও |

কথাগুলো ভীষণ প্রিয়

“ এই শতাব্দীর প্রারম্ভে লন্ডনের এক এক্স-রে ছবির প্রদর্শনীতে তিনি (সায়েব) গিয়েছিলেন | বেজায় ভিড় | নতুন রশ্মির অবিশ্বাস্য ক্রিয়াকলাপ দেখতে অনেকে এসেছেন | সায়েবের পাশে দাঁড়িয়ে এক চীনা ভদ্রলোকও ছবি দেখছিলেন | সায়েবের বয়স তখন খুব কম | বালকসুলভ চপলতা-বশে অজানা ভদ্রলোকটিকে তিনি বলে ফেললেন, “ কী আশ্চর্য, এই আলোতে দেহের প্রতিটি হাড় পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে !” দার্শনিকের গাম্ভীর্য নিয়ে চীনা ভদ্রলোকটি তার দিকে তাকিয়ে উদাসভাবে বললে, “Yes my boy. But only bones. Unfortunately, it does not show your heart.”

বই - কত অজানারে , শংকর
১লা সেপ্টেম্বার, ২০২৩ - বাতিঘর, রাজশাহী

শ্রদ্ধার্ঘ

৮ আগস্ট, ২০১৫| তকিরঘাট, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম - শিক্ষানবিশ হিসেবে আমরা কয়েকজন স্যারের সাথে তার গ্রামের বাড়িতে আমন্ত্রিত হই| "ঝুনির বাপের মসজিদ" এর পাশাপাশি আরও বেশ কিছু কাজ স্যার ঘুরে ঘুরে দেখান| বিস্মিত হই!

কংক্রিটের শহরের বড় বড় জটিলতা সামলে এত্ দূরে এতসব কিভাবে করে যাচ্ছেন একা হাতে! এত অসাধারণ সব সৃষ্টিশীল ও নান্দনিক চিন্তা পুঞ্জিভূত করে যেভাবে উনি দিয়ে যাচ্ছেন,আমরা তার কতটা নিতে পারছি - সেসময় চিন্তা করেছি|

আমরা তখন ধীরে ধীরে বেরে উঠছি| হোচট খাওয়া জীবনেরই অংশ - প্রতিনিয়ত স্যার শেখাচ্ছেন | বিশ্বাস রাখা - ভরসা করা - সৎ থাকা - আহা! আরও কত কিছু শিখছিলাম| স্থাপত্যকে পাশ্চাত্য দৃষ্টিকোণ থেকে না দেখে ঠিক নিজের করে দেখতে শেখাচ্ছিলেন| দেশীয় টেরাকোটার মাধ্যমে আমাদের ঐতিহ্য যে মসজিদের মত গুরুত্বপূর্ণ ও স্প র্শকাতর স্থানেও ফুটিয়ে তোলা সম্ভব সেটা উনি করে দেখিয়েছিলেন| স্যার বলতেন, "আমাদের মাদের শাড়ির আঁচলে যে নক্সা যুগের পর যুগ ধরে করা হচ্ছে, এটাই তো আমাদের কৃষ্টি| এটা রেখে তোমরা আধুনিকতার নামে পাশ্চাত্য উপাদান নিয়ে আসছ| " আমরা মুগ্ধ হয়ে শুনতাম| সত্যিই তাই| স্যার বলতেন, "রাস্তার পাশে হকাররা বসবে, এটাতে দোষটা কি? তুমি তাদের নির্দিষ্ট সময় বেধে দাও| আমি নিজে ওদের সাথে গল্প করি, কথা বলি, জিনিসও কিনি|

এটাইতো আমাদের বাঙ্গালি করেছে| তাই নয় কি? তুমিকি ইউরোপ আমেরিকা গেলে

এসব পাবে?” কি সহজ করে কত কঠিন বিষয়গুলো বলে যেতেন স্যার| স্যারের সাধারণ জীবন যাপন, সমাজের প্রতিস্তরের মানুষের প্রতি সচেতনতা আর দরিদ্রদের বুকে জড়িয়ে আনন্দ ভাগ করে নেয়ার যে অসামান্য ক্ষমতা ছিল তা আমাদের লোক দেখানো মেকি মুখোশ খুলে ফেলত |

“তোমরাই পারবে” - এই একটা কথা দিয়েই তিনি আমাদের অনেক কিছু শি-খিয়েছেন|

“চট্টগ্রাম আই ইনফারমারি” ”চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতালের ক্যান্সার বিভাগ” - এগুলোর মত সফিস্টিকেটেড কাজগুলোতে আমাদের ইনভল্ভ করে, আমাদের উপর

আস্থা রেখে সেসময় আমাদের আত্মবিশ্বাস কি পরিমান বৃদ্ধি করেছিলেন তা এখন বুঝতে পারি|

স্যারের সাহস আর উদ্দীপ্ত উৎসাহে পথ চলতে শুরু করার মাঝেই স্যারকে হারিয়েছি | অসীম আকাশকে সীমা দিয়ে বেধে ফেলা মানুষটা নিজেই অসীমে মি-লিয়ে

গেলেন | আর রেখে গেলেন তার তৈরি নিয়ম, ভালোবাসা, আস্থা দিয়ে তৈরি একটা সুন্দর সমাজ যেখানে তার প্রতি ভালবাসা আর সন্মানের কখনও কমতি হবে না |

স্কাই ইজ দ্যা লিমিট - আপনি যেখানেই থাকেন স্যার, জানবেন, আমরা আকাশ ছুবই|

৭ই মার্চ, ২০২১

নর্থবেঙ্গল এক্সপ্রেসে এক রাত

সমরেশ মজুমদার

হলদিবাড়ি থেকে ট্রেনটা জলপাইগুড়ি স্টেশনে পৌঁছোয় বিকেল পাঁচটায়। সময়টা শীতের না হলে মরা রোদের আলো নেতিয়ে থাকে প্ল্যাটফর্মে। হুড়মুড়িয়ে যাত্রীরা ঝাঁ-পিয়ে পড়ে কামরার দরজায়। ওই ট্রেনের যাত্রা শেষ হবে নিউজলপাইগুড়ি স্টেশনে। তার একটি বগিকে বলা হয় থু-কোচ। লোকাল ট্রেন থেকে তাকে সরিয়ে নিয়ে পাশের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ানো নর্থবেঙ্গল এক্সপ্রেসের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়। সেই ট্রেন নি-উজলপাইগুড়ি- শিলিগুড়ি ছাড়িয়ে রাত আটটায় চলতে শুরু করে দক্ষিণবঙ্গের দিকে। পাঁচটার অনেক আগেই স্টেশনে এসেছিল শিবনাথ। সঙ্গে বাবা, মা, ঠাকুমা এবং দুই বোন। দেবেশ এসেছিল তার ঠাকুরদার সঙ্গে। ততক্ষণে প্ল্যাটফর্মে ভিড় জমতে শুরু করেছে। শিবনাথকে দেখে দেবেশ কাছে আসতেই ঠাকুমা বললেন, “সাবধানে যেও বাবা। এতটুকু ছেলেরা একা একা কলকাতায় যাচ্ছে, ভাবতেই বুক কেঁপে উঠছে।”
দেবেশের ঠাকুরদা বললেন, “ওরকম বলবেন না। সতেরো বছর বয়স হয়ে গেল। এখনই তো ওদের স্বাবলম্বী হওয়ার সময়। দেখে শিখবে, ঠেকে শিখবে, শুধু পড়ে আর কত শেখা যায়।”
প্ল্যাটফর্মে যখন ভিড় উপচে পড়ছে তখন হুইসল বাজিয়ে প্রচণ্ড আওয়াজ তুলে ট্রেন প্ল্যাটফর্মে এল। সেটা স্থির হতেই যাত্রীরা ঝাপিয়ে পড়েছে। থ্রু-কোচের জানালা থেকে মুখ বাড়িয়ে রতন চিৎকার করল, “তাড়াতাড়ি উঠে আয়, দুটো বেঞ্চি রেখেছি।”
বন্ধুরা দলবেঁধে দুপুরের ট্রেনে গিয়েছিল হলদিবাড়িতে। দুটো বেঞ্চির দখল নিয়ে রেখেছে ওদের জন্য। সুটকেশ বেডিং নিয়ে ওরাই জায়গার দখল দিয়ে দিত। একটা বেঞ্চি ছেড়ে দিয়ে বলল, “এই বেঞ্চিতে তোরা দু-জন বসবি। রাতে শোয়ার সময় দু-জন দু-পাশে মাথা রেখে শুয়ে পড়বি। যাত্রীদের যারা জায়গা পায়নি তারা করুণ চোখে ওদের দিকে তাকিয়েছিল। বন্ধুদের একজন সেদিকে লক্ষ্য করে বলল, “দারুণ জিনিস যাচ্ছে রে, দাঁড়া, ওদের জায়গাটা দিয়ে দিই।”
উলটো দিকের যে বেঞ্চিটা ছেড়ে দিচ্ছিল ওরা তাতে এক বৃদ্ধদম্পতি আর অল্পবয়সি কিশোরীকে ডেকে এনে বসতে দিল সে। বৃদ্ধ বললেন, উঃ, বাঁচালে বাবা। নইলে সারারাত দাঁড়িয়ে যেতে হত। তোমরাও তো কলকাতায় যাবে বাবা?”

বন্ধু বললও না না, আমরা যাব না। আমাদের এই দুই বন্ধু যাবে। ওরা কলকাতার ক-লজে পড়তে যাচ্ছে। কোনও অসুবিধে হলে ওদের বলবেন। এর নাম দেবেশ, ওর নাম শিবনাথ। বলার সঙ্গে সঙ্গে হুইসল বেজে উঠল। ট্রেন ছাড়ছে, লোকজন কামরা থেকে হুড়মুড়িয়ে নামছে। সবাই নেমে গেলে দেখা গেল, যারা যাচ্ছে তাদের তিনগুণ লোক উঠেছিল পরিচিতদের সাহায্য করতে। দেবেশ প্ল্যাটফর্মের দিকে তাকাল। ট্রেন চলতে শুরু করামাত্র ঠাকুরদা হাত নাড়তে আরম্ভ করলেন। হঠাৎ সব আনন্দ একপাশে সরিয়ে জলপাইগুড়ি ছেড়ে যাওয়ার কষ্টটা যেন বড় হয়ে গেল। পাশ থেকে চাপা গায় শিবনাথ বললওএই কাঁদিস না।

উলটো দিকের বৃদ্ধ বললেনওপ্রথমবার বাড়ি ছেড়ে যাচ্ছ বোধহয়। কান্না তো পাবেই।

কথা ঘোরাবার জন্য শিবনাথ জিজ্ঞাসা করলওআপনারা কলকাতায় যাচ্ছেন তো?

“হ্যাঁ। ইনি আমার সহধর্মিণী, আর এটি হল আমার নাতনি। ক্লাস ইলেভেনে পড়ে। এখন স্কুল কামাই করা ঠিক নয়, কিন্তু ওর মাসি দেখতে চেয়েছে, তাই...।

শিবনাথ মেয়েটির দিকে তাকাল। তার দৃষ্টি জানালার বাইরে। মুখের গড়ন ঠিক সু-চিত্রা সেনের মতো। একটু তাকিয়ে থাকলেই বুকের ভিতর কীরকম করে। সুচিত্রা সেনের সিনেমা রূপশ্রী হলে তো দুবছর ধরে দেখছে সে আর দেবেশ। চারটেতে স্কুল ছুটি হয়। বাড়িতে ব্যাগ রেখেই ওরা ছুটে যায় রূপশ্রীতে। তখন ইনটারভ্যাল হয়ে সেকেন্ড হাফ শুরু হয়েছে। পাড়ার সনৎদা ওই হলের টিকিট চেকার। তার প্রশ্রয়ে বাকি সিনেমাটা দেখা হয়ে যায়। দেবেশ বলেওবিনা পয়সায় দেখছি, এই যথেষ্ট।

শিবনাথ মাথা নাড়ে, নারে, এই যে লাস্ট সিনে ওরা যেভাবে জড়িয়ে ধরল তা তো ফার্স্ট হাফে ধরেনি। আসল জিনিসটাই দেখা হয়ে গেল। শিবনাথ ফিশফিশ করে বললওদারুণ দেখতে, না।

ছুটন্ত ট্রেনের চাকার আওয়াজে সেই গলা উলটোদিকের বেঞ্চি পর্যন্ত পৌঁছোল না। দেবেশ নিচু গলায় বললওঠিক সুচিত্রা সেনের মতো দেখতে। ‘একদম সত্যি কথা। শিবনাথ বলল। ‘যেভাবে জানালার বাইরে তাকিয়ে দেখছে তাতে মনে হবে আমাদের লক্ষ্যই করছে না। তোরও কি তাই মনে

হচ্ছে?

উত্তর দেওয়ার আগে দাদু জিজ্ঞাসা করলেনওতোমরা কি বেড়াতে

যাচ্ছ? ‘না। শিবনাথ বললওআমরা কলকাতার কলেজে পড়তে যাচ্ছি।

দবা! চমৎকার।

শুনলে বাসুদিদি, তোমাকেও সামনের বছর এদের মতো কলকাতার কলেজে পড়তে যেতে হবে৷ আমরা তোমাকে কলকাতায় আবার নিয়ে যাব্৷ বৃদ্ধ বললেন৷

নাতনি মুখ না ফিরিয়ে বললওঠাম্মা, আমার নাম বাসন্তী, এটা দাদুকে মনে করিয়ে দেবে? বাড়ির নাম বাইরে শুনতে একটুও ভালো লাগে না্৷

বৃদ্ধ হেসে উঠলেন৷

বাসন্তী চোখ ফেরাল৷ দেখল দুই তরুণ তার দিকে মুগ্ধচোখে তাকিয়ে আছে৷ তার ঠোটের কোণে হাসি ফুটল৷ সে বলল, 'ঠাম্মা, আমরা কিন্তু ওদের নাম শুনতে পাইনি, তাই না্ব

ঠাকুমা মাথা নাড়লেনওহ্যাঁ, তোমাদের নাম কী বাবা্ব গদগদ গলায় নাম দুটো বলে দিল শিবনাথ৷

তা শোনার পর দেখা গেল বাসন্তী ব্যাগ থেকে বই বের করে পাতা খুলেছে৷ উলটো দিকে বসে ওরা চেষ্টা করল ওটা কী বই তা ঠাওর করতে৷ কিন্তু পারল না৷

নিউজলপাইগুড়ি স্টেশনে একটা ইঞ্জিন এসে তাদের বগিটাকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে গেল, পাশে দাঁড়িয়ে থাকা নর্থবেঙ্গল এক্সপ্রেসের সঙ্গে জুড়ে দিল৷ একটু পরেই ট্রেন ছাড়বে৷ ওরা দু-জন প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়েছিল৷ শিবনাথ বললওযাই বলিস, মেয়েটা কিন্তু দারুণ্৷

"দারুণ মানে? সুচিত্রা সেনের চেয়ে বেটার্ব ভ্যাট্ব

৩তুই ওই বয়সের সুচিত্রা সেনের ছবি দেখেছিস্ব "না৷ তখন তো সিনেমায় নামেননি্৷ তাহলে ভ্যাট বললি কী করে্ব হাসল দেবেশ৷

ট্রেন ছাড়ল সন্ধে পার করে৷ দুই বন্ধু জানে তাদের বাড়ি থেকে রাতের খাবার হিসেবে রুটি আর তরকারি দিয়েছে৷ ওপাশে বৃদ্ধা টিফিন কেরিয়ার থেকে খাবার বের করে কাগজের প্লেটে সাজাচ্ছিলেন৷ চাপা গলায় নাতনিকে কিছু বললেন তিনি৷ বাসন্তী মাথা সামান্য হেলিয়ে জিজ্ঞাসা করলওএকটা কথা বলব্ব

দু-জনে একসঙ্গে বলে উঠলওহ্যাঁ, হ্যাঁ্৷৩আমাদের সঙ্গে পরোটা তরকারি আর মিষ্টি খেতে কি আপত্তি হবে্ব

দু-জন দু-জনের দিকে তাকাল৷ তারপর দুটো মাথা নিঃশব্দে দু-পাশ ঘুরল৷ না৷

খাওয়া শেষ হলে বাসন্তী জিজ্ঞাসা করলওখারাপ লাগেনি তো্ব

দু-জনে প্রায় একসঙ্গে বলে উঠলওভালো, ভালো্৷

রাতের ছুটন্ত ট্রেনে বসে দাদু বললেনওতোমরা এবার শুয়ে পড়্৷ বাসন্তী মাথা নাড়ল, ওনা, তোমরা দু-জনে ঘুমিয়ে নাও৷ আমি মাথার পাশে জানালার ধারে বসছি্৷

ঠাকুমা বললেনওপাগল, এখানে দু-জনের পাশাপশি শোয়ার জায়গা নেই৷"

কথাগুলো শুনছিল উলটোদিকের দু-জন। শিবনাথ বলল,‘একটা উপায় আছে, দু-জন দু-দিকে মাথা করে শুলেই জায়গা হয়ে যাবে। ট্রাই করে দেখুন।’
ওরা দু-জনে টয়লেট ঘুরে এসে দু-জনে দু-দিকে মাথা রেখে শুয়ে পড়ল। শিবনাথ বলল,‘দেবু, জানালার দিকে মাথা কর, আমি উলটোদিকে মাথা করে শুচ্ছি।’
দেবেশ শুয়ে পড়ল শিবনাথ তার পায়ের পাশে মাথা রেখে নিচের দিকে তাকাতেই দেখতে পেল বাসন্তী তার দিকে এমনভাবে মুখ রেখে চোখের কোণে দেখছে যে ওকে সুচিত্রা সেন ছাড়া কিছুই ভাবা যাচ্ছে না। চোখাচোখি হওয়ামাত্র বাসন্তীর ঠোঁটে চিলতে হাসির ঢেউ খেলে গেল। এমন ভালোলাগা কখনও লাগেনি শিবনাথের। তার বুক নিংড়ে বাতাস বেরিয়ে এল। সে দেখল বাসন্তী মুখ ঘুরিয়ে জানালার বাইরের অন্ধকার দেখছে। ছুটন্ত ট্রেনের ইঞ্জিনের আওয়াজ ছাড়া কোনও শব্দ নেই। কামরার জোরালো আলোগুলো কেউ নিভিয়ে দিয়েছিল। কম বালবের আলো পড়েছে বাসন্তীর চুলে, কাঁধে। শিবনাথের মনে হল বাসন্তী ইচ্ছে করেই তাকে দেখছে না। সে যে ওর দিকে তাকিয়ে আছে তা স্পষ্ট বুঝতে পারছে বলে মনে হল শিবনাথের। রবীন্দ্রনাথের হঠাৎ দেখা কবিতার কথা মনে এল। ক-দিন আগে বাংলা স্যার পড়তে বলেছিলেন, ‘উঃ, রবীন্দ্রনাথের কী দারুণ দূরদৃষ্টি ছিল।’
ঘুমিয়ে পড়েছিল শিবনাথ। দেবেশের ডাকে ধড়ফড়িয়ে উঠে বসল। দেবেশ বলল, ‘ও-দিকে মাথা রেখে হাওয়া পাচ্ছি না। তুই অনেকক্ষণ হাওয়া পেয়েছিস, এবার আমাকে এদিকে মাথা রেখে শুতে দে।’
সারা শরীরে ঘুম। উঠতে ইচ্ছে করছিল না। তবু জায়গা পালটাল শিবনাথ। চোখ বন্ধ করার অগে সে উলটোদিকে তাকাতে বৃদ্ধের মাথা আর বৃদ্ধার পা দেখতে পেল। বাসন্তী বসে আছে জানালায়। তাকে দেখতে হলে ঘাড় ঘুরিয়ে মাথা উঁচিয়ে দেখতে হবে। মনে মনে দেবেশের মুণ্ডুপাত করতে লাগল। তারপর চোখ বন্ধ করল ঘুমের জন্য।
স্থান বদলে পাশ ফিরে শুয়ে সামনে তাকাতেই শ্বাসবন্ধ হওয়ার উপক্রম হল দেবেশের। তার দিকে মুখ ফিরিয়ে স্পষ্ট চোখে হাসছে বাসন্তী। না, কোনও ভুল নেই। এইরকম হাসি সাগরিকা ছবিতে সুচিত্রা সেন হেসেছিলেন। হাসিটা ফিরিয়ে দিতে গিয়েও পারল না দেবেশ। কীরকম লজ্জা লজ্জা করল। সে দেখল, ধীরে ধীরে বাসন্তী মুখ ঘুরিয়ে জানালার বাইরে আকাশ দেখতে লাগল। প্রতিটি মুহূর্তে সে আশা করছিল বাসন্তী আবার মুখ ফেরাবে। ফেরালে ওর হাসি সে আবার দেখতে পাবে। কিন্তু মুখ ফেরাল না বাসন্তী। রাতের আকাশ ঠিক কীরকম তা কামরার ভিতর বসে দেখা যায় না। দেবেশের মনে হল মেয়েদের মন ওই আকাশের চেয়েও অনেক বেশি রহস্যময়। ট্রেনের দুলুনি যে কখন তার চোখে রাশি রাশি ঘুম এনে দিল সে বুঝতেই পারেনি।

হঠাৎ একটা ঝাঁকুনি এমনভাবে কাঁধে লাগল যে ঘুম ভেঙে গেল দেবেশের। ধড়মড়িয়ে উঠে বসে দেখল বাসন্তী তার সামনে করুণ মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সে কিছু বলার আগেই শুনতে পেলওআমার সঙ্গে একটু যাবেন। আমার একা যেতে ভয় করছে।

শ্বাস বন্ধ হয়ে এল যেন, কোনোমতে দেবেশ প্রশ্ন করল, "কোথায়ঽ আমি টয়লেটে যাব।

শোনামাত্র কর্তব্যবোধে আক্রান্ত হল দেবেশওহ্যাঁ, হ্যাঁ নিশ্চয়ই। সে বেঞ্চি থেকে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে দেখল শিবনাথ ঘুমে কাদা হয়ে আছে। ওপাশে বাসন্তীর দাদু-দিদিমাও জেগে আছেন বলে মনে হচ্ছে না। বাসন্তীর সামনে হেঁটে এল দেবেশ। দু-পাশের বেঞ্চিতে বেশিরভাগ যাত্রী ঘুমের ছোঁয়া এড়াতে পারছেন না। টয়লেটের সামনে কামরার মেঝেতে কাপড় পেতে দু-জন এমনভাবে শুয়ে রয়েছে যে যেতে হলে ওদের টপকে যেতে হবে। কড়া গলায় তাদের ঘুম ভাঙিয়ে রাস্তা করে সে টয়লেটের দরজা খুলে বললওযান।

উকি মেরে ভিতরটা দেখে বাসন্তী বললওআপনি যাবেন না, প্লিজঽ

ওনা না, আমি আপনার জন্য এখানেই দাঁড়িয়ে আছি।

বাসন্তী ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করল। দেবেশ চারপাশে তাকাল। ছুটন্ত ট্রেনের এই কামরাতে এখন ঘুম ঘুম ভাব। তাদের দিকে কেউ তাকাচ্ছে না। হাসল দেবেশ। ব্যক্তিগত প্রয়োজনে বাসন্তী তারই সাহায্য নিল। বেচারা শিবনাথ জানতেই পারল না। কাল ওকে ব্যাপারটা বলতেই হবে। বাসন্তীর সঙ্গে তার যদি কোনও সম্পর্ক তৈরি হয় তাহলে কি খুশি হবে না শিবনাথ?

মাথা নিচু করে ভাবছিল দেবেশ, হঠাৎ কানে এলওএবার তুই যা। চমকে মুখ তুলে দেখল শিবনাথ তার পাশে দাঁড়িয়ে। হাসল শিবনাথওতুই পৌঁছে দিয়েছিস, আমি নিয়ে যাব। ব্যাপারটা ফিফটি ফিফটি হওয়া উচিত, তাই না।'

"তুই এতক্ষণ জেগে ছিলিঽ খুব বিরক্ত হল দেবেশ।

ওনা। বুড়ো দাদু আমাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে বললওদ্যাখ তো আমার নাতনি টয়লেটে যেতে পারল কিনা। তাই দেখতে চলে এলাম। এখানে দু-জনের দাঁড়িয়ে থাকাটা খারাপ। তুই গিয়ে শুয়ে পড়। আমি ওকে নিয়ে আসছি। হাসল শিবনাথ।

ইচ্ছে করছিল না, তবু চলে আসতে হল। এসে দেবেশ দেখল দাদু-ঠাকুমা মড়ার মতো ঘুমোচ্ছে, শিবনাথের কথা সত্যি হলে অত তাড়াতাড়ি এমন ঘুম ঘুমোতে পারে না বুড়ো। এই বুড়োটার খুব সন্দেহবাতিক। নাতনিকে বিশ্বাস করে না বলে শিবনাথকে পাঠিয়েছে। তার মানে ব্যাটা আগে থেকেই জেগেছিল! কিন্তু দেবেশ বুড়োকে ক্ষমা করে দিল।

বাসন্তী বাথরুমে যেতে চেয়ে তার ঘুম ভাঙিয়েছে। ও তো চাইলে শিবনাথকেও ঘুম থেকে তুলতে পারত, কিন্তু তোলেনি। ও পছন্দ করেছিল তাকেই। কিন্তু এখনও ওরা ফিরে আসছে না কেন? কী করছে বাসন্তী এতক্ষণ টয়লেটে? শরীর খারাপ হয়নি তো? নাকি টয়লেট থেকে বেরিয়ে আসার পর নাছোড়বান্দা শিবনাথের সঙ্গে গল্প করছে! দেখতে যেতে ইচ্ছে করছিল কিন্তু সংকোচে যেতে পারল না। এই সময় উলটোদিকের বেঞ্চি থেকে দাদুর গলা ভেসে এল,ওএকি, বসে আছ কেন?ঃ শোনামাত্র শুয়ে পড়ল দেবেশ। তারপরেই খেয়াল হল একটু আগে সে যেদিকে মাথা করে শুয়েছিল এখন তার উলটোদিকে মাথা করেছে। সেই প্রথমবারের মতো। তাড়াতাড়ি জায়গা বদল করল সে, আর তখনই ওরা ফিরে এল। জানালার কাছে বসার জায়গায় পৌঁছে বাসন্তী যে থ্যাংক ইউ শব্দদুটো উচ্চারণ করল তা যেন স্প ষ্ট শুনতে পেল দেবেশ। একি। ধন্যবাদ দিচ্ছে কেন বাসন্তী! টয়লেটে নিয়ে গিয়েছিল তো সে, ধন্যবাদ দিচ্ছে শিবনাথকে! অদ্ভুত তো?

ভোর হতে না হতেই নদীর পাশে পৌঁছে গেল ট্রেনটা। অমনি যাত্রীরা যে যার মালপত্র নিয়ে বালির উপর দিয়ে ছুটতে লাগল, স্টিমারে উঠবে বলে। ওই স্টিমার তাদের নদী পার করে দেবে। সেখানে দাঁড়িয়ে আছে নর্থবেঙ্গল এক্সপ্রেস যা শিয়ালদায় পৌঁছোবে বিকেল শেষ হলে।

বাসন্তী বলল,ওদাদু, আমি দৌড়ে গিয়ে স্টিমারে জায়গা রাখছি। তোমরা কুলিকে নিয়ে মালপত্র বইয়ে আস্তে আস্তে এস।ঃ বলে সে ট্রেন থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ল। ঠাকুমা বললেন, "হ্যাঁরে, তুই একা যাবি?ঃ

শিবনাথ নেমে পড়ল,ওআচ্ছা আমি সঙ্গে যাচ্ছি। চল, দৌড়োও।ঃ দেবেশ কিছু বলার আগেই শিবনাথ বাসন্তীর সঙ্গে বালির উপর দিয়ে অন্য যাত্রীদের সঙ্গে দৌড়োতে লাগল। প্রচণ্ড রেগে গেল দেবেশ। যাওয়ার আগে একবারও তার সঙ্গে কথা বলার প্রয়োজন বোধ করল না শিবনাথ? ওর ব্যাগ, বেডিং পড়ে আছে কামরায়, বোধহয় দৌড়োতে অসুবিধে হবে বলে সঙ্গে নিয়ে যায়নি।

কুলির মাথায় মালপত্র চাপিয়ে ওরা স্টিমারে উঠতে শিবনাথের গলা শুনতে পেল, 'ও দাদু, ও ঠাকুমা, এদিকে আসুন।ঃ

থিতু হয়ে বসার পর দাদু বললেন,ওএকটু চা খাওয়া যাবে ভাই?" শিবনাথ বলল, "চল দেবেশ, চা নিয়ে আসি।ঃ ঠাকুমা বললেন, "এখন আমি চা খাব না।ঃ শিবনাথ তাকাল বাসন্তীর দিকে, 'তুমি?ঃ মাথা নাড়ল বাসন্তী, 'আমি চা খাই না।ঃ শিবনাথ বলল,ওচল দেবু, চা নিয়ে আসি।ঃ দেবেশ মাথা নাড়ল, 'আমি এখন চা খাব না।ঃ

কাঁধ নাচিয়ে চলে গেল শিবনাথ৷ ধীরে ধীরে স্টিমারের রেলিংয়ের গায়ে সরে এল দেবেশ৷ বিরাট নদীর জলে সূর্যের আলো সবে পড়েছে৷ হঠাৎ দেবেশের মনে হল সে অযথা মনখারাপ করছে৷ বাসন্তী যদি শিবনাথের সঙ্গে কথা বলতে বেশি পছন্দ করে তাহলে তা করতেই পারে৷ তার মন কেন মন খারাপ হচ্ছে৷ এটা ঠিক নয়৷

"কী দেখছেন?"

মুখ ঘুরিয়ে দেবেশ দেখল বাসন্তীকে, পাশে এসে দাঁড়িয়ে স্টিমারের রেলিংয়ে হাত রেখে নদীর জলের দিকে তাকিয়ে আছে৷

"কিছু না৷"

ওএকটা কথা জিজ্ঞাসা করব? বাসন্তী জিজ্ঞাসা করল৷ "হুঁ৷'

কাল টয়লেটের সামনে থেকে চলে এলেন কেন? প্রশ্ন করল বাসন্তী৷ অবাক হয়ে বড় চোখে বাসন্তীর দিকে তাকাল দেবেশ৷

ঠিক তখনই দাদুর গলা ভেসে এল, 'বাসুদিদি, আমার ওষুধটা দাও দেখি৷"

জবাবের আশায় থাকলাম৷ নীচু গলায় তিনটে শব্দ বলে চলে গেল বাসন্তী৷ সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শরীর ঝিমঝিমিয়ে উঠল৷ দেবেশের মনে হল, পৃথিবীর কারোর উপর তার কোনও রাগ নেই৷

বাদল ধারা

সকালে সাধারণত ঘুম ভাঙ্গে কবুতরের শব্দে | চোখ কচলাতে কচলাতে রুমের বাইরে আসলে চোখ ঝলসে যায় সামনে দাড়িয়ে থাকা সাড়ি-সাড়ি কৃষ্ণচূড়ার লাল টুপি দেখে, যার ফাক দিয়ে কিছু কিছু সবুজ চুল বের হয়ে থাকে | ওরা তখন সূর্যের সাথে আঁতাত করে বেশ ভাব দেখায় | ওদের ভাব আর আমার আশ্চর্য আরও বেরে যায় যখন টিয়ার ঝাঁকগুলো ওদের টুপির উপর বসে বিশ্রাম নেয় | আজকের ব্যাপারটা একটু ভিন্ন | কবুতরের ডাক শোনা যায়নি | বাইরে বের হতেই ভাবুক মশায়দের দিকে চোখ পড়ল | সূর্য্যি মামা ছুটিতে গেছে বলে ওদের বেজায় মন খারাপ | মাথা নিচু করে দাড়িয়ে আছে | আজ ওদের টুপি ভিজে চুপসে গেছে, যার ফাক দিয়ে বেড়িয়ে পড়া চুলগুলো স্প ষ্ট দেখা যাচ্ছে | চট্রগ্রাম আর রাজশাহীর বর্ষাকালের মধ্যে সবচেয়ে বড় পার্থক্য হল বজ্রপাতের শব্দ | রাজশাহীর মানুষজন এত ভালো যে সৃষ্টিকর্তা বেশি জোরে বজ্রপাত করে তাদের ভয় দেখায় না | আর চট্রগ্রামেতো আমার শ্রবণশক্তি দিন দিন লোপ পাওয়ার উপক্রম

বর্ষাকাল আসলেই আমার ছোটবেলার কথা মনে পড়ে | আমার রুমে পড়ার টেবিলটার ঠিক পাশেই ছিল জানালা | পড়ার সময় বৃষ্টি শুরু হলে টেবিলে আর মন বসত না | বসে বসে বৃষ্টির কণা দেখতাম | শান্ত স্বভাবের ছিলাম বলে বাইরে যাওয়ার পারমিশন ছিলনা | অবশ্য এই বাধা যখন ভাঙ্গলাম তখন বুঝলাম ছোট বেলায় কি জিনিসটাই না মিস করেছি, অবশ্য মিস করেছি বললে ভুল হবে, কারণ ব্যাগের ভেতর ছাতা রেখে সেটা বাসায় ফেলে যাওয়ার অজুহাতে বেশ কয়েকবার স্কুল থেকে কাক ভেজা হয়ে ফিরেছি

 বাদলা দিনে মনে পড়ে, ছেলে বেলার গান
বৃষ্টি পড়ে - টাপুর টুপুরু নদে এল বান ||

৪ঠা মে, ২০১৩

মৃত্যু

আমি তখন ক্লাস সেভেন কিংবা এইটে | আমাদের পরিচিত একজন ভদ্রলোক মারা যাওয়ার খবর আসে বাড়িতে| আমি ঘরে ছিলাম | যিনি খবরটা দিতে এসেছিলেন তিনি বেশ নিখুঁতভাবে বলছিলেন ব্যাপারটা |
ঘটনা হল যিনি মারা যান তিনি ছিলেন পারিবারিক ভাবে অত্যান্ত অসচ্ছল | বিভিন্নভাবে বিভিন্ন রকম কাজ জোটানোর চেস্টা করে যাচ্ছিলেন সেসময়| স্বাভাবিকভাবেই যৌথ পরিবারে তার বাবা মার সাথে তার স্ত্রী ও পুত্র সন্তানও ছিল | দারিদ্রের কড়াঘাত বড়ই নির্মম | সেই জ্বালা সহ্য করতে না পেরে তিনি আত্মহত্যার পথ বেছে নেন | আত্মহত্যার মাধ্যম হিসেবে তিনি আগুনের আশ্রয় নেন | ব্যাপারটা এতটাই আকস্মিত ভাবে ঘটান যে কেও বুঝে উঠতেই পারেনি | তিনি দিনের বেলা হঠাত ঘরের দরজা বন্ধ করে নিজের গায়ে কাথা জাতীয় কিছু দিয়ে কেরোসিন লাগিয়ে আগুন ধরিয়ে দেন | আগুন জলতে থাকে, আর পুরতে থাকে তার ভেতরের যত যন্ত্রনা | যিনি ঘটনাটা বর্ণনা করছিলেন তিনি এটাও বলেছিলেন যে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার আগ মুহুর্ত পর্যন্ত ওই ব্যাক্তি কাথাটা শরীরে জাপ্টে ধরে রেখেছিলেন |
এই ঘটনা আমাকে মানসিক ভাবে প্রচন্ড কষ্ট দিয়েছিল সেদিন | ভেবেছিলাম একটা মানুষ ঠিক কতটা কষ্ট পেলে শারিরিক কষ্টের কাছে নতি স্বীকার করে নিজেকে শেষ করে দিতে পারে !
আজ কতগুলো বছর পার হয়ে গেছে| শুনেছি সেই ভদ্রলোকের স্ত্রী পুত্র ভা-লা আছে| এতটা কঠিন সময় তাদেরকে জীবন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে বাধ্য করতে পারেনি | তারা লড়ে গেছে|
হঠাত আজ কেন এই কথা ? কারনটা বলি | গতকাল যারা আগুনে পুরে মারা গেছেন, তাদের বেশিরভাগই এসেছিলেন সেসব রেস্তরায় খেতে | নিঃসন্দেহে ধরে নেয়া যায় তারা গতকাল রাতে একটা অংশে সুখি মানুষ ছিলেন বলেই পরিবার পরিজন নিয়ে বাইরে নৈশভোজ করতে বেরিয়েছিলেন| আর তারা যখন টের পান তারা আগুনে জলসে যাচ্ছে - যাদের মানসিক যন্ত্রনা নেই, তখন কি পরিমান শারীরিক যন্ত্রনায় কাতর হয়েছিলেন তা হয়ত আমার নুন্যতম বোঝারও ক্ষমতা নেই |

নিচে যে ব্যাক্তির পোস্ট শেয়ার করেছি নিশ্চয় তিনি ভাগ্যের জোরে জমের দুয়ার থেকে ফিরে এসেছেন, মৃত্যু কে খুব কাছ থেকে দেখেছেন তিনি | কিন্তু যারা মৃত্যুবরন করলেন , বা যারা নিজের চোখের সামনে আপন জন কে পুরে যেতে দেখলেন তারা ? মানসিক আর শারীরিক ভাবে কি পরিমাণ যন্ত্রনা তাদের সহ্য করতে হয়েছে ভাবতেও গা শিউরে ওঠে |

সচেতনতা একটা অভ্যাস | একটা আচার | একটা শিক্ষা | আমরা জাতি হিসেবে যেকোন ক্ষেত্রে অনেক বেশি অসচেতন | আমাদের অনেক শেখার বাকি আছে | আমরা ভুল কে ভুল বলতে শিখি না , ভাল অভ্যাস রপ্ত করতে শিখি না , মানুষকে শ্রদ্ধা করতে শিখি না |

কেন ? কবে শিখব ? কবে অন্যের জীবনের দাম দিতে শিখব ?? কবে ?

গতকাল রাতের ঘটনায় সকল মৃতদের আত্মার শান্তি কামনা করছি | আর যারা বেচে গেছেন তাদের সুস্থতা কামনা করছি |

ঘটনা ঃ বেইলি রোডের অগ্নিকান্ড
১লা মার্চ, ২০২৪ | ব্যাংকক, থাইল্যান্ড

পুরনো সেলোফিন

আজকের বৃষ্টি ভেজা সকালে এই মাসে কেনা কিছু পুরনো বই উল্টে পালটে দেখছিলাম। ১৯৯৬-এ কোনো এক অরিন্দম তার প্রিয়তমার জন্মদিনে বইটা দিয়েছিলেন।
কি কাকতালীয় ! এই সেপ্টেম্বরেই ছিল সেই প্রিয়তমার জন্মদিন। ২৭ বছর আগে এই মাসেই কিছু অনুভূতি আটকে পরে বইটায়। কিছু চাপা অনুভূতি !
ভালোবাসা হল সকালের মত। স্বার্থের লম্বা ছায়া সুর্য ওঠা মাত্র ছোট হতে আরম্ভ করে। সুর্য যখন মাথার ওপর তখন ছায়া পায়ের তলায়। ভালোবাসার পুর্নতা তখনই হয়ে যায়। তারপর যত বেলা গড়ায়, ছায়া লম্বা হয়, তত ভালোবাসার আয়ু ফুরিয়ে আসে। পৃথিবীতে সব কিছুর মত ভালোবাসার আয়ু বড় ক্ষণস্থায়ী।
সময় প্রবাহমান। আগামী ৩০ বছর পরের সেপ্টেম্বারে এই অনুভুতিগুলো আবার কার কাছে ফিরে যাবে জানতে ইচ্ছে করছে।

২২ সেপ্টেম্বার, ২০২৩। রাজশাহী

জেনারেশন গ্যাপ

এই জেনারেশনের ছেলে-মেয়েরা নাকি বড়দের সন্মান করতে জানেনা - আমিও এইটা ভাবতাম | তবে এখন আমার ভাবনায় পরিবর্তন এসেছে - এই জেনারেশনের প্রবীণ-রা কি ছোটদের প্রাপ্য স্নেহ আর ভালোবাসা দিচ্ছে, নাকি তারা শুধুমাত্র জ্ঞানের গরিমায় সন্মান পিপাসু হচ্ছে?

আর্লি থারটিসে এসে বলতেই পারি আমি অনেক রকম মানুষের সান্নিধ্য পেয়েছি | প্রচন্ড রকমের উদার, স্নেহপরায়ণ উচ্চ জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তি যেমন দেখেছি, অধিক জ্ঞান সম্প ন্ন নিম্ন মানসিকতার মানুষও কম দেখিনি | খুব কম সময়ের জন্য হলেও প্রফেসর আলি আশরাফ স্যার, ডা কামরুজ্জামান স্যার, ফটে-াগ্রাফার সোয়েব ফারুকি স্যারদের মত মানুষের কাছে থাকতেও আলাদা শান্তি অনু-ভব করেছিলাম | একইভাবে বেশ কিছু তথাকথিত প্রৌড় ব্যক্তির সান্নিধ্য আমার মধ্যে যন্ত্রণার তৈরি করেছিল | এই দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষরাই আবার আশা করে তারা পর্যাপ্ত সন্মান পাচ্ছেনা | অথচ প্রথম শ্রেণীর ব্যাক্তিরা কখনো সন্মান পিপাসু হয় না, তারা এমনিই অর্জন করে ফেলে | কি বিচিত্র সেলুকাস !

আমি কাওকে কটাক্ষ বা কারও প্রতি ক্ষোভ থেকে বলছিনা, আমি শুধু আশা রাখছি আ-মরা প্রবীণদের উদার মানসিকতায় সিক্ত হব, আমাদের জীবনটা তারা সহজ করতে সাহায্য করবেন্ তাদের প্রাপ্য সন্মান তখন নির্দিধায় তাদের কাছে ধরা দিবে | জ্ঞানের অহংকার কাম্য নয়, জ্ঞানের স্বভাব স্রোতের মত-, ভাসিয়ে দিতে জানতে হয়, তবেই নতুন জ্ঞান আসে |

অবশ্য এটাও সত্যি যে নির্বুদ্ধিতাই অহংকারের জন্ম দেয় |

৫ই মে, ২০২৪ | ব্যাংকক, থাইল্যান্ড

অসমাপ্ত গল্প

নিঃশ্বাস

অন্ধকারের চাঁদর মুড়ি দিয়ে আছে বারান্দাটা। গুরিগুরি বৃষ্টিতে বাতাস ভিজে চুপসে গেছে। বিকেল শুরুর কিছু আগ দিয়েই কাওকে না জানিয়েই শুরু হয়েছে বৃষ্টি। যদিও বর্ষণে যথেষ্ট আলসেমি দেখা যাচ্ছে। আমার ছোট্ট ঘরটা থেকে বারান্দা পুরোটাই দেখা যায়। এই ঘরটায় জানালা নেই। বৃষ্টি না থাকলে এই সময়টা আমি বারান্দায় দাড়িয়ে বাতাস গায়ে মাখি। সারাদিনের ক্লান্তি তখন নিমিষেই উবে যায়। আজ অবশ্য বারান্দায় না যেতে পারার আক্ষেপ হচ্ছে না। বৃষ্টি দূর থেকে ক্লান্তি দূর করার ক্ষমতা রাখে, গায়ে মাখতে পারলে সেটা উপরি পাওয়া।

বৃষ্টি দেখতে দেখতে দূরে দাড়িয়ে থাকা সারি বাঁধা বিল্ডিং গুলো নজরে আসলো। পলেস্তারা খসে পরা পুরনো ভবনগুলো আজ আরও কিছুটা জীর্ণ দেখাচ্ছে। আমার ছোট্ট জানালা বিহীন ঘরটার পাশেই এসি করা মস্ত বড় ঘর। সেখান থেকে হা-লকা গোঙানির শব্দ আসছে থেমে থেমে। প্রচণ্ড যন্ত্রণার পরের ধাপে মানুষ গোঙাই। চিৎকার করার মত সেই শক্তিটুকু তখন তার মদ্ধে অবশিষ্ট থাকেনা। গোঙান নিয়ে বেশ বিচিত্র রকমের অভিজ্ঞতা আছে আমার, এমন কিছু যা একজন সাধারণ মানু-ষর থাকেনা। এমন অভিজ্ঞতা হওয়ার পেছনে যথেষ্ট কারন আছে। কারণটা আমার কর্মক্ষেত্র। বেশি ভণিতা করতে গিয়ে আসল কথাটাই বলতে ভুলে গেছি , এটা বল-লই সব ক্রিস্টাল ক্লিয়ার হয়ে যাবে।
আমি কাজ করি সরকারি মর্গে। নিজ থেকে নিশ্চয় অনেক কিছুই ভাবতে শুরু করেছেন এখন। আপনার ভাবনার বাইরেও যে কতকিছু থাকতে পারে সেসব এখন আপনাকে বলতে চলেছি।
ছোট একটা জেলা শহরে সরকারি হসপিটালের মর্গে চাকরি করছি সারে পাঁচ বছর হল। আমি এই চাকরিটা পাই বাবার সুবাদে। অপঘাতে মৃত্যুর কারণে বাবার পোস্টে আমাকে দেয়া হয়েছে। বাড়িতে বৃদ্ধ মা ছাড়া কেও নেই। মা শুরুর দিকে আমার বিয়ের জন্য বেশ তোড়জোড় করলেও যখন আমার দিক থেকে কোন সাড়া পেলেন না তখন বুঝে গেছেন আমি আমার বাকিটা জীবন একাই কাটাতে আগ্রহী। কেনই বা হব না ? লাশ কাটা ঘরে কাজ করা সামান্য একজনের জীবনে বড় রকমের পরিবর্তন যে কখনই আসবেনা এটা জেনেও আরেকজন আমার জন্য প্রতিটা দিন অপেক্ষা করে থাকবে এটা মেনে নেয়া যায়না। মৃত শরীরের গন্ধ লেগে থাকা শরীরটাকে একজন প্রাণবন্ত উচ্ছল মানুষ কতটা ভালোবেসে জড়িয়ে ধরতে পারবে ?

- অসমাপ্ত -

সমাপ্ত

ভাবনায় শান দেয়ার জন্য কিছু বিষয় রেখে গেলাম |

কথা কম আর বেশি কাজেই কি আসবে সাফল্য ?

ভালো কোনটা ?
খারাপ কোনটা ?

গো
পসিটিভিটি

আসক্তি কি শক্তি হতে পারে ?

মানসিক ?
দুর্বলতা কি

আরেকটু গভীরে
ভাবছি কি ?

আমার পথের গল্পগুলো

গৌরব দে

www.gouravdey.com
www.facebook.com/gourav.arch
gourav0055@gmail.com